পালি সাহিত্যে চন্দ্রকথা

ভিক্ষু সত্যপাল

গ্রন্থ-বিবরণী

গ্রন্থ-শীর্ষক	:	পালি সাহিত্যে চন্দ্রকথা
গ্রন্থকার	:	অধ্যাপক ডঃ ভিক্ষু সত্যপাল
প্রকাশক	:	বুদ্ধ ত্রিরত্ন মিশন, দিল্লী
মুদ্রণের ব্যয় ভার বহন করেছেন	:	Sri Chetraj Gautam Prop. Sanchi Press
প্রকাশ-কাল	:	২৮. ০৫. ২০১০
সংস্করণ	:	প্রথম (১০০০ কপি)
কম্পোজিং ও ডিজাইনিং	:	শ্রী সরিৎ বড়ুয়া
প্রচ্ছদ অলংকরণ:		রাহুল গৌতম (Rahul Gautam)
কপি-রাইট	:	গ্রন্থকার (সর্বাধিকার)
মুদ্রক	:	Sanchi Press, Delhi – 97 Tele.: 42141457; 9899590504

গ্রন্থকারের অস্থায়ী বাসস্থান	:	C-2 (29-31), Probyn Road (Chatra Marg) University of Delhi Delhi – 110007 (India) Tele: 011 – 27667003 Mob. 9968218648 Email: bhikshusatyapala@live.com bhantesatyapala@gmail.com buddhatriratnamission@yahoo.com

Printed and donated for free distribution by
The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation
11F., 55 Hang Chow South Road Sec 1, Taipei, Taiwan, R.O.C.
Tel: 886-2-23951198 , Fax: 886-2-23913415
Email: overseas@budaedu.org
Website:http://www.budaedu.org

This book is strictly for free distribution, it is not for sale.
এই বই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, বিক্রয়ের জন্য নহে।

প্রশস্তি

ঁচন্দ + র চন্দ্র, স্ত্রী চন্দ্রা, অর্থ আনন্দদায়ক, দীপ্ত, কমনীয়, ইন্দু, নিশাকর বিধু, মৃগাঙ্ক, শশধর, শুধাংশু, সোম, হিমাংশু ইত্যাদি। আমরা বা চাঁদ। নির্মল আকাশে চন্দ্রের কী অপরূপ রূপ-মাধুরী। ভগবান বুদ্ধের ঊর্ণাও চন্দ্রাকৃতি। পালি সাহিত্যে বলা হয়েছে ভগবান বুদ্ধের ঊর্ণাও চন্দ্রের মত গোলাকার। তার মধ্যে শ্বেতশুভ্র কেশ গুচ্ছ। চন্দ্র-রশ্মির মতই তার থেকে উজ্জ্বল আলোক-রশ্মি নির্গত। ললিত-বিস্তরে বলা হয়েছে, সর্বার্থসিদ্ধি ভ্রূ-যুগলের মধ্যে হিম ও রজতের মত রোম। সে বর্ণনাও এক সৌন্দর্যর অভিযোজন-

'উণ্ণাপপুণ্ণসসিমণ্ডলতো গলিত্বা,
পাদম্বুজঙ্গুলি দলট্ঠ সুধা লবানং'।[১]

পরিপূর্ণ শশিমণ্ডল হতে জ্যোৎস্নার লাবণ্য-প্রবাহের মত ভগবানের ভ্রূ-যুগলের ক্ষুদ্র কুঞ্চিত রোমরাজী হতে অমৃতধারা তাঁর পদাম্বুজের অঙ্গুলিদলের উপর বর্ষিত হতেছে।

চাণক্যও যথার্থই বলেছেন,

'শর্বরী ভূষণং চন্দ্রঃ।'

কবিরা মহাপুরুষের পদনখেও চন্দ্রের অবস্থান কল্পনা করেছেন,

'গোকুলচন্দ্রের নখচন্দ্রে চন্দ্র লয়েছে শরণ'[২]
শাক্ত কবির মাতৃ বন্দনায় আছে শিশু উমা

'মুকুরে হেরিয়া মুখ উপজিন মহাসুখ

---

[১]। বুদ্ধপদামৃত মাধুরী, আশাদাশ ২য় সং, ২০০৬
[২]। দাশরথি রায়ের পাঁচালী, পৃ ৪৮

বিনিন্দিত কাটি শশধরে'[৩]। (রামপ্রসাদ)

আবার 'সুনীল আকাশে ঐ শশী দেখি,

কৈ গিরি, আমার কৈ শশিমুখী'[৪] (গোবিন্দ চৌধুরী)

'চন্দ্র' বহু ভাবে প্রযুক্ত একটি নাম।[৫]

১। ইনি দেবতা বিশেষ। ব্রহ্মার মানস পুত্র। অত্রির নেত্র নীর থেকে উৎপন্ন, ২। রত্ন, মহাভারতে সমুদ্র মন্থনে জাত চতুর্দশ রত্নের মধ্যে একতম। ৩। কর্পূর, ৪। জল, ৫। স্বর্ণ, ৬। বিসর্গ বর্ণ- এর লিখিত রূপে অর্ধ চন্দ্রের সঙ্গে বিন্দু যুক্ত-ঁ ৭। ময়ূরপুচ্ছের গোলচিহ্ন- চন্দ্রক। ৮। রক্তমুক্তা ফল, ৯। আহ্লাদজনক দ্রব্য, ১০। শ্রেষ্ঠার্থক, ১১। দ্বীপবিশেষ, ১২। ভ্রূ-মধ্যস্থ সোমমণ্ডল, ১৩। মৃগশিরা নক্ষত্র, ১৪। এক এই সংখ্যা- 'একে চন্দ্র'। ১৫। চন্দ্রগুপ্ত-মৌর্যবংশীয় সম্রাট ১৬। চন্দ্র সদৃশ জ্যোতিষ্ক মণ্ডল, ১৭। চন্দ্রকান্ত মণি (moon stone), ১৮। চন্দ্রমৌনি-শিব, ১৯। জ্যোৎস্না-চন্দ্রিকা।

নানা জ্ঞান-বিজ্ঞানও অনুশীলিত হয়েছে। আছে কত-কত আখ্যান ও কাহিনী। এক কথায় পালি সাহিত্য-সম্ভার মৌলিক চিন্তা শক্তির উদ্‌বোধক। সৌন্দর্য উপলব্ধি ও সাহিত্য বোধ সমৃদ্ধ মুক্ত শুদ্ধ রস- রুচির পূর্ণাঙ্গ পরিচয়ও বহন করে। পালি সাহিত্যে চন্দ্র-কথা এমন একটি রস সমৃদ্ধ প্রসঙ্গ। ড. সত্যপাল এমন একটি সুন্দর বিষয় নিয়ে লেখনি ধরেছেন। বিষয়টি ছোট অথচ তথ্যবহুল। তিনি পালি সাহিত্যে চন্দ্রের ভূমিকা ও উপস্থিতি সংক্ষেপে, অতি সুকৌশলে পরিবেশন করেছেন। প্রবন্ধটি পাঠকের দৃষ্টি খুলে দেবে। অধ্যাপক সত্যপাল বিভিন্ন ভূমিকায় চন্দ্রের অবস্থান ও ভূমিকা সহজ ও সুসংলগ্নভাবে উপস্থাপন করেছেন। লেখকের বক্তব্য যুক্তিনিষ্ঠ, তথ্যবহুল। বিষয়ের প্রতি সহৃদয় আন্তরিকতাও আছে। পালি

---

[৩]। শাক্ত-পদাবলী, অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) পৃ ৩।
[৪]। তদেব, পৃ ৫।
[৫]। হরিচরণ বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বঙ্গীয় শব্দকোষ', ১ম ভাগ অবলম্বনে, পৃ ৮৫৮

সাহিত্যের এমনি ছোট-ছোট দিক যা চিন্তার জগতের দুয়ার খুলে দেয়। সেরূপ বিষয় নিয়ে আলোচনার বহুল সম্ভাবনা রয়েছে। লেখকের প্রদর্শিত পথ আমাদেরও গ্রহণীয় হোক।

আশা দাশ
অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা
পালি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
পশ্চিমবঙ্গ

প্রস্তাবনা

অনেকের ধারণা পালি সাহিত্য মূলত একটি ধর্মীয় সাহিত্য হওয়ায় এক বিশেষ ধর্মের প্রবর্তকের অর্থাৎ ভগবান বুদ্ধের জীবনী বা জীবন-লীলা বা সুদীর্ঘ ৪৫ বছরের বুদ্ধচর্যার কথাই কেবল এতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এ ছাড়া এতে আর পঠনীয় কিছুই নেই। পালি সাহিত্যে অনভিজ্ঞ পাঠকরাই এ ধরণের মন্তব্য করে থাকেন।

পালি (বুদ্ধকালীন জনভাষা মাগধী) ভাষায় রচিত বুদ্ধবাণী মূলত দেশিত, সংগৃহীত ও সংরক্ষিত (পালিত) হওয়ায় এ সংগ্রহমূলক সাহিত্যকে পালি সাহিত্য বলা হয়। এর সাহিত্যের মূলাধার হল ভগবান বুদ্ধের জীবনী, জীবনাদর্শ ও তাঁর ধর্ম। তাঁর ধর্ম ও সংঘের বিস্তারের সাথে পালি সাহিত্যেরও বিস্তার হয়েছে। শ্রীলংকা, থাইল্যাণ্ড, লাওস, কম্বোডিয়া ও ম্যায়ানমার আদি স্থবিরবাদী দেশে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির চর্চার সাথে সাথে পালি ভাষার ও পালি সাহিত্যের পরম্পরাগত চর্চা আজও চলছে অবিরাম গতিতে। তবে কোথাও বেশী, আর কোথাও একটু কম। মাত্রার এ ভেদ অবশ্যই রয়েছে। এ সাহিত্যের উদ্ভব ও বিস্তার কাল প্রায় ২৬০০ বছর। এ সুদীর্ঘ কালের প্রয়াসে রচিত নানারত্নের আকর-তুল্য এ পালি সাহিত্যের আকার বিশ্বের অন্যান্য সব ধর্ম-সাহিত্যের আকার অপেক্ষা অধিকতর বিশাল। মূল বুদ্ধবাণীকে সম্বল করেই এ নতুন সৃজিত সাহিত্যের সাহিত্যিক যাত্রার শুভারম্ভ হয়।

মহাকারুণিক তথাগত বুদ্ধ কোন এক কালে, এক দেশে, কোন এক জাতি বা বর্ণ বিশেষের বা এক বিশেষ ব্যক্তির উদ্দেশ্যে তাঁর ধর্মপ্রচার করেন নি। সুব্যবস্থিত সংঘের উদ্দেশ্যে নির্দেশ ছিল-- বহুজনের হিতে বহুজনের সুখে আদিকল্যাণকারী, মধ্যকল্যাণকারী ও অন্তকল্যাণকারী ধর্মের প্রচার করার অর্থাৎ সমাজের সব শ্রেণীর দুঃখী-জনের দুঃখ-হরণের উদ্দেশ্যে অনুকম্পাবর্ষণ করত এ ধর্মের ব্যাপক প্রচার করার।

মুক্ত পুরুষ ব্যতীত দুঃখী প্রাণীর বিশেষত মানুষের দুঃখের কি শেষ আছে? কোন না কোন দুঃখ কোন না কোন প্রকারে তাকে পিছু করছেই। বাল্যকালের সমস্যা এক প্রকারের, যুবাবস্থার সমস্যা আরেক প্রকারের, জরা-গ্রস্তের সমস্যা আরেক প্রকারের, বাধর্ক্য-সমস্যা আরেক প্রকারের। সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষের পৃথক সমস্যা রয়েছে। শোষিত সমাজের সমস্যা শাসক শ্রেণীর সমস্যা হতে রঙ্গে রূপে ভিন্ন প্রকারের। পঞ্চস্কন্ধময় প্রাণীর জীবনটাই হচ্ছে সমস্যাময়।

সমস্যাগ্রস্ত মানুষ সমস্যার সমাধানে 'আজ বুদ্ধ কোথায়?' আর 'কাল বুদ্ধ কোথায়?' খোঁজ করতেন। যখনই খোঁজ পেতেন- শাস্তা আজ ওমুক গ্রামের ওমুক বিহারে আছেন বা কাল থাকবেন, মানুষ ছুটে যেতেন। সেখানে মানুষের ছুটে যাবার মূলত দুটি কারণ ছিল- হয় সমস্যার স্থায়ী সমাধান পেতে, আর না হয় শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞতা জানাতে। শহরে-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে, বিহারে আর অরণ্যে যেখানেই তিনি থাকতেন দিনে বা রাতের বিশ্রামের স্বল্প সময়টুকু বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সময়ে শ্রোতা বা দর্শনার্থীর ভীড় লেগেই থাকতো। ধর্মযাত্রাকালেও তাঁর কথা হতো সমাজের সব শ্রেণীর মানুষের সাথে। আগন্তুকের সমস্যার প্রকার ও মাত্রাভেদে শাস্তা তাঁর উপদেশের বিষয় ও শৈলী বদলাতেন। এ কারণে বুদ্ধবাণী আর পালি সাহিত্যের নানা শ্রেণীভেদ করা হয়েছে। সমস্যার সমাধানে শাস্তা শ্রোতাদের ভাষা, পেশা, পরিবার, পরিবেশাদির প্রতি দৃষ্টি রেখে ধর্মোপদেশ দিতেন। একারণে বুদ্ধবাণীতে ও পালি সাহিত্যে ধর্ম-সংগ্রহ ছাড়াও এতে রয়েছে বুদ্ধকালীন ভারতীয় সমাজের প্রচলিত রীতি-নীতি লোক-কলা, লোক-শিল্প, লোক-সংস্কৃতি, লোক-পরম্পরা, জন-ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, রাজনীতি, জলবায়ু, ঋতু-চক্র সংক্রান্ত সূচনা। এছাড়াও আছে চিকিৎসা-বিদ্যা, জীব-বিদ্যা, মনোবিজ্ঞান, মানব-বিজ্ঞান, যুদ্ধ-বিদ্যা, শিল্প-বিদ্যা, বাস্তু-বিদ্যা, রত্ন-বিদ্যা, অঙ্গ-বিদ্যাদি আরও কত কি। শুধু সেকালীন বৃহত্তর ভারতের (জম্বুদীপ) আভ্যন্তরীন সূচনা ছাড়াও বহির্ভারতের নানা সীমান্তবর্তী এমন কি দূর-দূরান্তবর্তী কিছু দেশের আভ্যন্তরীন গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বসনীয় সূচনারও সমাবেশ এতে রয়েছে।

শুধু ধরাতলের ঘটনাই নয়, এতে রয়েছে আকাশে, বাতাসে ও সৌরমণ্ডলে ঘটিত বা ঘটমান ঘটনার সূচনাও। গ্রহ-কথা, নক্ষত্র-কথা, চন্দ্র-কথা, সূর্য-কথা, রাহু-

কথা, দেবাসুর-সংগ্রাম-কথা, প্রেত-কথা, দেব-কথা, কর্ম-কথা, কর্ম-বিপাক-কথা, আরও অনেক কথা এতে রয়েছে। এ ছাড়াও রয়েছে আরো কত অনালোকিত কথা।

এ সবের মধ্য হতে একটি মাত্র কথায় এখানে আলোকপাত করা হয়েছে। আর সেটি হল চন্দ্র-কথা। চন্দ্র তার আপন গুণে আর বিশেষ করে মানবের সৌন্দর্য প্রিয়তার গুণে বিশ্বের সব দেশের সাহিত্যে এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে বিশেষত ধর্মীয় সাহিত্যে চন্দ্রের সাথে জীব-জগতের অভিন্ন সম্পর্কের অনেক কথা নানা ভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। ভারতীয় জনমানসে প্রবাদবাক্যরূপে ব্যাপ্ত কিছু অশ্রুত-পূর্ব চন্দ্র-কথার চর্চা পালি সাহিত্যের যেখানে সেখানে ছড়িয়ে রয়েছে। এই ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার কারণে সাধারণ পাঠক, এমন কি বৌদ্ধ সমাজেও এ চন্দ্র-কথা তেমন প্রচলিত নয়। পালির পাতা উল্টে যা পেয়েছি তা আর গোপন রাখতে পারি নি। তার আত্মপ্রকাশ "পালিসাহিত্যে চন্দ্র-কথা" শীর্ষক ছোট্ট গ্রন্থাকারে হল।

এ গ্রন্থের পরিচয়াত্মক 'প্রশস্তি' কথা লিখে পালি ভাষা ও সাহিত্য জগতের স্বনামধন্যা বিদূষী অধ্যাপিকা ডা. আশা দাশ মহোদয়া আমার কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হয়েছেন। ভাই সরিৎ এর পাণ্ডুলিপিকে যত্নসহকারে কম্পিউটারে সংকলন করে ও সুশোভনাকারে রূপসজ্জা দিয়ে আমার স্নেহভাজন হয়েছেন। আর্থিক সহায়তা দিয়ে এর আত্মপ্রকাশে সহযোগিতা প্রদান করায় সাঁচী প্রেসের সত্ত্বাধিকারী শ্রী চেতরাজ গৌতমকে প্রাণভরে আশীর্বাদ জানাই। ত্রিরত্নগুণ প্রভাবে তাদের অভীষ্ট মনোকামনা অচিরে পূর্ণ হউক।

তারিখ : ২৮.০৫.২০১০ ভিক্ষু সত্যপাল
তিথি : বুদ্ধ পূর্ণিমা গ্রন্থকার

পালি সাহিত্যে চন্দ্র-কথা

'চন্দ্র': এটি একটি সংস্কৃত শব্দ। এর পালি রূপ হল **'চন্দ'**। পালি সাহিত্যে একে **'চন্দিমা'** নামেও অভিহিত করা হয়েছে। আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যেও চন্দ্রের নানা নাম রয়েছে। হিন্দীতে 'চন্দ্রমা', চন্দা, আর বাংলায় 'চন্দ্র' ও 'চাঁদ' বলা হয়। বিশ্বের প্রমুখ দেশসমূহের আধুনিক ও পৌরাণিক সাহিত্যেও চন্দ্র-চর্চা নানা নামে হয়েছে।

এ নিবন্ধে পালি সাহিত্যে বর্ণিত চন্দ্র-চর্চার কথাই কেবল চর্চিত হবে। পৌরাণিক সাহিত্যের ন্যায় পালি সাহিত্যেও হয়েছে তবে বিশেষ কিছু সূত্রে ও জাতকে। কখন চন্দ্র একা, আর কখনও চন্দ্র ও সূর্যের বর্ণনা একত্রে হয়েছে। এর এক সংক্ষিপ্ত বিবরণী এখানে প্রস্তুত করার প্রয়াস করা হয়েছে। পালি সাহিত্যের ভিত্তিতে চন্দ্র-কথা বিষয়ক কোন গবেষণামূলক নিবন্ধ এখনও লেখা হয়নি।

চন্দ্রের সৃষ্টি: পালি পিটক-সাহিত্যের **অঙ্গুত্তরনিকায়ের** (A.V. 60) বর্ণনাসুসারে সৌরমণ্ডলের **(চক্কবাল)** বিনাশের পর সৃষ্টির সংরচনাকালে প্রাণীরা **'আভাস্বর'** নামক ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করেন। নতুনভাবে সৃষ্ট প্রাণীজগতের (আভাস্সর ব্রহ্মলোকের) প্রথম নিবাসীগণের (ব্রহ্মগণের) মনে এক নতুন 'বিমান' সৃষ্টির ইচ্ছে হয়েছিল। এরপর এক 'বিমানে'র সৃষ্টি হয়। ব্রহ্মগণের ইচ্ছায় (ছন্দে) এর সৃষ্টি হওয়ায় এর নাম রাখা হয় **'চন্দ'** (**অমহাকং ছন্দং ঞত্বা বিয় উট্ঠিতো, তস্মা চন্দো হোতূ'তি**)। (Vibha. 519, PSA. 253.) একে 'চন্দ্রিমা' ও বলা হয়।

চন্দ্র-বিমানের নিবাসী: দেবতাদের নিবাস-স্থানকে 'বিমান' বলা হয়। অতীতজন্মের বিশেষ বিশেষ পূণ্যকর্মের সুপরিণামে প্রাণীরা তাদের মৃত্যুর পর দেব-ব্রহ্মলোকের 'বিমানে' জন্মগ্রহণ করেন। দেবকুলে জন্মগ্রহণ করে দিব্য সুখ-সম্পত্তি উপভোগ করেন। এ সুখ তারা 'বিমানে' থাকা-কালেই উপভোগ করেন। কাজেই বলতে হয় প্রতিটি বিমানের মুখ্য দেবতার ইচ্ছানুসারে মুহূর্তেই দিব্য সুখ-

সুবিধার সৃষ্টি হয়। এমনকি বিমানও অদৃশ্য হয়ে যায়। বিমানের মুখ্য নিবাসীর সুখ-সুবিধা দানের উদ্দেশ্যে আরও অনেক দেবতাও ঐ বিমানে থাকেন। অতীতের পূণ্যকর্মের সুখ-বিপাক শেষ হওয়া মাত্রই ঐসব দিব্য সুখ-সম্পত্তি নিমেষে উবে (অদৃশ্য হয়ে) যায়।

এ চন্দ্র-বিমানের মুখ্য নিবাসীর (দেবতার) নাম **'চন্দ'** (চন্দ্র)। কিছু সূত্রে একে **'চন্দিমা'** ও **'চন্দিমস্'** বলা হয়েছে। **'চন্দিমা'** কে (চন্দ্রিমা) অনেকক্ষেত্রে চাতুর্মহারাজিক দেবলোকের নিবাসীরূপেও বর্ণনা করা হয়। চন্দ্র-বিমানেও অন্য বিমানের ন্যায় একাধিক সহযোগী দেবতারা থাকেন।

চন্দ্র ও সূর্যের সম্বন্ধঃ চন্দ্র-দেবতার ন্যায় এক দেবতার নাম সুর্য (সুরিয়) -দেবতা। চন্দ্র ও সুর্যের শরীর বিশালকায় ও দিব্য আভামণ্ডিত। তবে এদের আভামণ্ডল অন্য সাধারণ দেবতাদের চেয়ে অনেক বেশী। এদের পৃথক পৃথক বিমান রয়েছে-- চন্দ্র-বিমান ও সূর্য-বিমান। এ দুটি বিমানের আভাও অন্য সাধারণ বিমানের আভা অপেক্ষা অধিকতর উজ্জ্বল। অন্য দেবতাদের ন্যায় চন্দ্র-দেবতা ও সূর্য-দেবতা উভয়েই দেবরাজ ইন্দ্রের (পালিতে **'সক্ক'**) অধীনস্থ। পৌরাণিক ও পালি উভয় সাহিত্যে চন্দ্র ও সূর্যের চর্চা প্রায় একসাথে হতে দেখা যায়।

রাহুর গ্রাসে চন্দ্র ও সূর্যঃ প্রাণী জগত দু-প্রকারের- দৃশ্য প্রাণী-জগত অদৃশ্য প্রাণী-জগত। মানুষের পরিপার্শ্বস্থ আবিস্কৃত ও অনাবিস্কৃত খালি চোখে, দূরবীক্ষণ বা অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায় না এমন কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপাদি, অপদী, দ্বিপদী, চতুষ্পদী ও বহুপদী প্রাণীসমূহ অদৃশ্য প্রাণী-জগতের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। আর যাদের অস্তিত্বকে উপরোক্ত উপায়ে দেখা যায় না, অথচ মহাপুরুষদের দিব্যচক্ষুতে দেখা যায়, দিব্যশ্রোতে তাদের বার্তালাপ শোনা যায়, এমন সব প্রাণীদের অদৃশ্য প্রাণী-জগতের শ্রেণীতে শ্রেণীভুক্ত করা যেতে পারে। পালি সাহিত্য মতে এমন অসংখ্য প্রাণীর বাস আমাদের চারপাশে রয়েছে। এমন অদৃশ্য প্রাণীদের আবার নানা শ্রেণী রয়েছে। সংস্কার, আহার, বিহার ও ব্যবহার, আয়ু, বর্ণ সুখ, বলাদির ভেদে তাঁদের শ্রেণীভেদ হয়ে থাকে, যেমন- ভূত, প্রেত, দৈত্য,

দানব, দেবতাদি। এমনি এক অদৃশ্য প্রাণীর শ্রেণীর নাম 'দেবতা'। বুদ্ধিমত্তা ও বীরত্বে দেবতাদের ছাড়া অদৃশ্য প্রাণীদের মধ্যে যাদের আয়ু, বর্ণ সুখ, বল অন্য প্রাণীদের তুলনায় অধিক রয়েছে, অথচ দেবতাদের তুলনায় হীন-প্রবৃত্তির প্রাধান্য রয়েছে তাদের 'অসুর' বলা হয়।

দেবগণের (সুর) রাজা হলেন দেবরাজ ইন্দ্র (সংস্কৃত-শক্র; পালি-**সক্ক**)। দেবকুলের হিত রক্ষা করা দেবেন্দ্র শক্রের কাজ। অন্যদিকে অসুরদেরও দলপতি বা রাজা রয়েছে, তবে একজন নয়, তিন জন। তাঁরা হলেন-বেপচিত্তি, রাহু ও পহারদ। এদের মধ্যে মানব-সমাজে 'রাহু' অধিক পরিচিত। বেপচিত্তি রাহুর বন্ধু। অসুরগণের মধ্যে ঈর্ষাভাবের আধিক্যটা বেশী। তারা সহজে পরশ্রী সহ্য করতে পারেন না। কাজেই দেবতাদের আয়ু, বর্ণ, সুখ, বলাদি বৈভব অধিকতর হওয়ায় অসুরগণ স্বভাবতই ঈর্ষান্বিত হন। অসুরদের দলপতি হওয়ার অসুরেন্দ্র রাহুর ঈর্ষার মাত্রা আরো বেশী হয়।

দেবতাদের মধ্যে দেবরাজ ইন্দ্রের বৈভব মাত্রা সর্বাধিক। এরপর বৈভবশালী দেবতাদের মধ্যে চন্দ্র (-দেব) ও সূর্য (-দেব) দুয়ের স্থান। অসুরেন্দ্র 'রাহু' চায় তাঁদের দুজনকে তার অধীনস্থ করে রাখতে। কিন্তু এর উল্টো, তাঁরা রাহুর প্রভাব-প্রতিপত্তিকে উপেক্ষা করে স্বতন্ত্রভাবে চলতো। এ দুয়ের গতি রোধ করার উদ্দেশ্যে রাহু নানা ফন্দি আটে, কিন্তু কোন ফন্দি কাজে আসে নি। তাই রাহু আরো ক্ষুব্ধ হয়েছিল। একবার চন্দ্র (-দেব) ও সূর্য (-দেব) একসাথে কোথাও যাচ্ছিলেন। তাদের দুয়ের অন্য মনস্কতার সুযোগ বুঝে রাহু তার মুখ-বিবর এত বড় করে দাঁড়ায় যেন চন্দ্র ও সূর্যের পথ অনায়াসে রাহুর মুখে প্রবেশ করে। চন্দ্র ও সূর্য আপন মনে পথ-পরিক্রমায় ব্যস্ত ছিলেন। মুহূর্তের জন্যেও তাঁদের মনে কোন প্রকারের শংকা হয় নি যে তাঁদের যে তাঁদের চলার পথ রাহুর মুখে গিয়ে শেষ হচ্ছে বা তারা ক্রমশ রাহুর মুখে প্রবেশ করতে চলেছে। দেখতে না দেখতেই তাঁরা রাহুর মুখ-গ্রস্ত হন মুখ বন্ধ করা কালে রাহুর দাঁতের চাপ পড়ে তাদের গায়ে। তখন তাঁরা বুঝতে পারেন যে তাঁরা রাহুর গ্রাসে গ্রস্ত হয়েছেন। প্রাণ-রক্ষার তাগিদে তাঁরা উভয়ে ভগবান বুদ্ধকে স্মরণ করেন। ভগবান বুদ্ধের

দিব্যদৃষ্টিতে তা জানা হয়। তিনি রাহুকে নির্দেশ দেন-- ঐ দুজনকে ছেড়ে দেবার। অগত্যা রাহু চন্দ্র ও সূর্য্যকে গ্রাস মুক্ত করেন। রাহু জানতেন এদেরকে মুক্ত না করলে তিনি নিশ্চয়ই কোন এক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবেন। **(চন্দপরিত্তং ও সুরিয়পরিত্তং)**

সৌরমণ্ডল চন্দ্রঃ বৌদ্ধ সাহিত্য **(মিলিন্দ-পঞ্হো)** মতে আমরা যেখানে বাস করি তাকে পৃথিবী বলা হয়। পৃথিবীর চারপাশে সমুদ্র (অথৈ জলরাশি)। তার চার পাশে বায়ু। বায়ুর চারপাশে আকাশ বিদ্যমান। এ আকাশে আমাদের পৃথিবীর মতো অসংখ্য পিণ্ড ভাসমান রয়েছে। তাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে ভ্রাম্যমান রয়েছে। এমন পিণ্ড সমূহকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে-

(১) কিছু কিছু হতে আলো ও তাপ বিচ্ছুরিত হয়। এদের বলা হয় 'তারা'। এমন অনেক তারা রয়েছে। এদের একটি হল সূর্য। সূর্য অন্য 'তারা' অপেক্ষা পৃথিবীর নিকটতর হওয়ায়, পৃথিবীবাসীর কাছে তা বিশালাকারে ও উজ্জ্বলতর দেখায়।

(২) এমন তারা ছাড়াও অন্তরিক্ষে অসংখ্য পিণ্ড রয়েছে যাদের নিজস্ব আলো ও উত্তাপ নেই; তবে এরা সূর্য ও অন্য তারা হতে আলো ও তাপ দুই-ই গ্রহণ করে। এমন এক একটি পিণ্ডকে 'গ্রহ' বলা হয়। আমাদের পৃথিবীও একটি 'গ্রহ'। দুরত্বের ক্রম অনুসারে গ্রহদের নাম এরূপ- বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাম, নেপচুন, প্লুটো।

সৌরমণ্ডলঃ সূর্য সহ এর নয়টি গ্রহের সমূহকে সৌরমণ্ডল বলা হয়। সৌরমণ্ডলে উপরোক্ত নয়টি গ্রহ ছাড়াও আরো কিছু পিণ্ড (সদস্য) রয়েছে যারা গ্রহের চারপাশে প্রদক্ষিণ করে। এদের আকার গ্রহাপেক্ষা ছোট। এদের বলা হয় উপগ্রহ।

বুধ ও শুক্র ছাড়া শেষ সবকটি গ্রহের এক বা একাধিক উপগ্রহ রয়েছে। আমাদের পৃথিবীর একটি মাত্র উপগ্রহ রয়েছে। এর নাম- চন্দ্র। অন্য উপগ্রহের ন্যায় চন্দ্রের নিজস্ব আলো ও উত্তাপ নেই। চন্দ্রের ধরাতলে জল নেই। আর ওতে বায়ুও নেই।

একারণে চন্দ্র দিনে অত্যধিক গরম ও রাতে অত্যধিক শীতল হয়।

চন্দ্রের সৃষ্টিঃ পৃথিবীর সৃষ্টির কথা না বলে চন্দ্রের সৃষ্টির কথা বলাটা অযৌক্তিক হবে বলে মনে করি।

বৈজ্ঞানিকদের ধারণা সূর্য হতে গ্যাসীয় তত্ত্ব পিণ্ডাকারে বেড়িয়ে আসে। অন্য তারার গুরুত্বাকর্ষণে আকর্ষিত হয়। এমন ছোট ছোট পিণ্ডকে গ্রহাণুও বলা হয়। এ গ্রহাণুগুলো টুকরো টুকরো অবস্থায় সূর্যের চারপাশে আপন আপন কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করতে থাকে। এভাবে গ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। এভাবে পৃথিবীরও সৃষ্টি হয়েছে।

চন্দ্রের সৃষ্টির ব্যাপারে সর্বসম্মত কোন এক নির্দিষ্ট মত নেই। এক শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক মনে করেন সূর্য হতে ছিটকে বেড়িয়ে আসা ক্ষুদ্রতর আকারের পিণ্ডসমূহের একটি পৃথিবীর আকর্ষণে আকর্ষিত হয়ে পৃথিবীর চারপাশে প্রদক্ষিণরত হয়েছে। এরই নাম চন্দ্র। আরেক শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকদের মতে কোন এক বিশালকায় উল্কাপাতজনিত সংঘর্ষে পৃথিবীর যে স্থলে উল্কাপাত হয়েছিল সেখানে গর্ত হয়ে যায়। জলে ভরাট হয়ে তা সমুদ্রে পরিণত হয়। যে অংশ ছিটকে বেড়িয়ে পৃথিবীর চারপাশে প্রদক্ষিণরত রয়েছে তা চন্দ্র নামে পরিচিত হয়।

চন্দ্র ও সূর্য-এর পরিক্রমা পথ ও গতিতে পৃথিবী ও পৃথিবীবাসী জীবসমূহের জীবন ও জীবন-যাপন শৈলী নানাভাবে প্রভাবিত হয়। এ কারণে পৃথিবীবাসীর মুখে ও এখানকার সাহিত্যে চন্দ্র-সূর্যের স্তুতি-কথা অন্য গ্রহ, নক্ষত্র ও তারা অপেক্ষা অধিক হয়। ধর্মপদের গাথা হতে তা প্রমাণিত হয়। এমন এক গাথায় (গাথা-সংখ্যা- ৩৮৭) বলা হয়েছে- **দিবা তপতি আদিচ্চো, রত্তিং আভাতি চন্দিমা**। অর্থাৎ সূর্য (আদিত্য) দিনে তাপ দেয়, আর রাতে চাঁদ আভা দান করে। সূর্য নিজে একটি জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড। তা হতে নিরন্তর অগ্নিশিখা বিচ্ছুরিত হয়। আগুনের সাথে আলো ও তাপ দুই বের হয়। সরাসরি তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। পৃথিবীর যে অংশে সূর্যের আলো পড়ে সে অংশ আলোকিত হয়। সাথে তা উত্তপ্ত হয়। চন্দ্রের নিজস্ব কোন আলো বা তাপ নেই।

চন্দ্রের উপরিতল ধূসর মরুভূমি হওয়ায় এতে প্রতিফলনের গুণ বিদ্যমান। সূর্যের কিরণ নির্বাধ-গতিতে চন্দ্রের যে অংশে প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীর যে অংশে পড়ে কেবল সেই অংশেরই প্রাণী চন্দ্রের ঐ অংশকে দেখতে পারে। চন্দ্রের অনালোকিত অংশ পৃথিবীবাসীর চোখে পড়ে না। একারণে প্রতিফলিত হয়ে আসার কারণে সূর্যের কিরণ চন্দ্রের কিরণ **(চন্দ্রিকা)** বলে প্রতিভাত হয়। আর এ কারণেই চন্দ্রের কিরণ পৃথিবীবাসীর কাছে শান্ত, শীতল, স্নিগ্ধ ও মধুর বলে মনে হয়। চন্দ্র-কিরণ জীবের কাছে অধিককাল সহনীয় হয়।

আজ অবধি আবিস্কৃত বৈজ্ঞানিক গবেষণাজাত তথ্যভিত্তিতে প্রমাণিত হয়েছে যে পৃথিবী সূর্যের, আর চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে আপন আপন কক্ষপথে এক নির্দিষ্ট গতিতে অনন্তকাল ধরে লাট্টুর মতো ঘুরপাক খেয়ে আসছে। চন্দ্র ও পৃথিবীর এ প্রদক্ষিণ-প্রক্রিয়ার পরিণাম-স্বরূপ পৃথিবীতে যথাক্রমে দিন-রাত ও ঋতুচক্রের সৃষ্টি হয়।

চন্দ্র ও পৃথিবীর এ পথ-পরিক্রমার কারণে পৃথিবীবাসীর জীবের নিকট চন্দ্র নানা আকারে দৃষ্ট হয়। মনুষ্যেতর জীবজগতে চন্দ্রের বিভিন্ন আকারের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়নি। বিশ্বের মানব-সমাজের প্রায় সাহিত্যে বিশেষত ধর্মীয় সাহিত্যে চন্দ্রের নানা আকারের কথা নানারূপে ও নানা ছন্দে আলংকারিক ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। আকারের পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় মাসে এমন একদিন আসে যেদিন (তিথিতে) চন্দ্র একেবারেই দেখা যায় না। এ তিথিকে এশীয় মহাদেশের অধিকাংশ দেশের পৌরাণিক ও ধর্মীয় সাহিত্যে 'অমাবস্যা তিথি' বলা হয়। এ তিথিতে চন্দ্র দেখা যায় না। একথা বলতে চন্দ্রের অনস্তিত্ব মোটেই বোঝায় না। এক নির্দিষ্ট সময়ের (কাল বা তিথি) জন্যে চন্দ্রের অনালোকিত অংশ পৃথিবীবাসীর দৃষ্টিগোচর হয় না এই মাত্র। কিন্তু ধর্মীয় সাহিত্যে এ ঘটনাকে রূপকথার মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে।

'অমাবস্যা তিথি'র পরদিন হতে তা নানা আকারে দৃষ্ট হয়। অমাবস্যার পরবর্তী পনেরটি দিন বা তিথিকে ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রে ক্রমান্বয়ে প্রতিপদা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী, একাদশী, দ্বাদশী,

ত্রয়োদশী, চতুর্দশী, পঞ্চদশী তিথি নামে নামাংকিত হয়। প্রতিটি তিথির পরিবর্তনে চন্দ্রের আকার পরিবর্তন হয়। 'চন্দ্রের আকার পরিবর্তত হয়' বলতে চন্দ্র বাস্তবিক পক্ষে ছোট বা বড় হয়ে যায় এমন বোঝাটা বিজ্ঞানসম্মত হবে না। ছোট বা বড় আকারে দৃশ্যমান হয় মাত্র। এভাবে পরিবর্তিত (স্ফীত) হয়ে চন্দ্র ক্রমশ পূর্ণাকার প্রাপ্তির পথে এগিয়ে যায়। পঞ্চদশীতে তা তার পূর্ণ গোলাকার রূপ পায়। পূর্ণাকারে দৃষ্ট চন্দ্রকে (মণ্ডল) পূর্ণচন্দ্র বলা হয়। যে তিথিতে পূর্ণচন্দ্র (পুণ্ণমি) দৃষ্ট হয় তা পূর্ণিমা তিথি (Full Moon Day/ Night)। বিশ্বের ধর্মীয় সাহিত্যে এ তিথি অতি চর্চিত। পূর্ণিমা তিথির পরদিন হতে প্রতিদিন চন্দ্র আকারে ক্ষীয়মান হয়ে থাকে। পরবর্তী পঞ্চদমী (অমাবস্যা) তিথিতে তা আবার সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে পড়ে। এভাবে চন্দ্রের এ ক্ষীয়মান ও বর্দ্ধমান আকারের ভিত্তিতে প্রতিটি মাসকে দুটি পক্ষে ভাগ করা হয়। পূর্ণিমার পরদিন হতে অমাবস্যা হবার পনের দিনের সমূহকে 'কৃষ্ণপক্ষ' এবং অমাবস্যার পরদিন হতে পূর্ণিমা তিথি অবধির দিন-সমূহকে 'শুক্ল পক্ষ' বলা হয়। কৃষ্ণ ও শুক্ল পক্ষের অষ্টমী, চতুর্দশী বা পঞ্চদশী এ চার তিথিতে সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবীর মধ্যে ক্রিয়াশীল অভিকর্ষণ ও মাধ্যাকর্ষণের কারণে প্রাকৃতিক ও জৈবিক সম্বন্ধের ঘনত্বের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়; এর কারণে জীবের তন ও মনে নানা ধরণের পরিবর্তন হয়। এসব পরিবর্তন হতে সম্ভাব্য হানির মাত্রাকে কমানোর; লাভের মাত্রাকে বাড়ানোর; এবং জীবকে পরমার্থ প্রাপ্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে বিশ্বের ধর্মাচার্যগণ নানাবিধ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, উপবাস-ব্রতাদির পালনের নির্দেশ দিয়ে থাকেন।

চন্দ্র তার শীতল, স্নিগ্ধ ও মৃদু কিরণের কারণে জীব-জগতের কাছে অন্য গ্রহ-নক্ষত্রের চেয়ে অধিকতর প্রিয়। চন্দ্র যে শুধু উদ্ভিদ-জগতের অঙ্কুরণে, প্রস্ফুটনে, বিকশনে সহায়ক হয় তা নয়, জীবের সৃজনশীল মনোরঞ্জনেও তার ভূমিকা অতুলনীয়। এছাড়াও তার আরও অনেক কাজ রয়েছে। অন্যভাবে বলতে হয় জীবও তার আত্মোত্থানে চন্দ্রকে নানাভাবে কাজে লাগিয়েছে। এর প্রমাণ বৌদ্ধ সাহিত্যে, বিশেষত পালি সাহিত্যের অন্তর্গত জাতক-সাহিত্যে প্রচুর পাওয়া যায়।

জাতক-সাহিত্য পালি সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত এক বিশেষ শ্রেণীর সাহিত্য। বুদ্ধত্ব (সর্বজ্ঞতা) প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে বোধিসত্ত্বরূপে অগণিত অতীত জন্মে পারমিতা

(বুদ্ধকারক গুণের)- পূর্তির নিরন্তর যে প্রয়াস করেছিলেন তার পালি গাথাবদ্ধ সংক্ষিপ্ত বর্ণনাই জাতক সাহিত্য। এতে ৫৪৭টি জাতক রয়েছে। এসবের বিস্তৃত ব্যাখ্যা আচার্য বুদ্ধঘোষ রচিত জাতক-অর্থকথায় লিপিবদ্ধ।

বৌদ্ধ পরম্পরা মতে বোধিসত্ত্ব (অর্থাৎ ভাবী বুদ্ধ) যে রূপে (যোনি) জন্মগ্রহণ করে থাকুক না কেন নিজ চরিত্রগুণে অপর সহচর প্রাণীর মধ্যে বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত হয়ে থাকেন। বোধিসত্ত্বগণের চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তারা কোন কারণে কোন পরিস্থিতিতে তাদের জীবনের পরম লক্ষ্য বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি ও বুদ্ধ-কারক পারমিতা-পূর্তির কথা বিস্মৃত হন না। তাঁরা নিজেরা ধর্মপথে চলেন, সাথে অপর সহচর প্রাণীদেরকেও ধর্মপথে চলার আপ্রাণ প্রয়াস করেন ও প্রেরণা দেন।

এমন বিশাল জাতক-সাহিত্যের একটি হল **শশজাতক** (J.513)। **শশজাতকের** মুখ্যপাত্র শশ। শশ ছাড়া আর তিন পাত্রের চর্চা রয়েছে এ **শশ-জাতকে**। তাঁরা হলেন-- বানর, শিয়াল ও উদবিড়াল। এরা সবাই শশের ঘনিষ্ট বন্ধু। প্রতিদিন প্রাতে তারা সবাই এক জায়গায় এসে বসতেন। শশ পণ্ডিতের সাথে শলা-পরামর্শ করে তারা প্রতিদিনের দিনচরিয়া নির্দ্ধারণ করতেন। এরপর তারা নিজ নিজ গোচরভূমিতে যেতেন। দিনান্তে তারা আবার একত্রিত হতেন। এভাবে তাদের সবার দিন কাটতো। বোধিসত্ত্ব শশ চাঁদের আকার দেখে অপর বন্ধুদের ডেকে বলতেন-- 'দেখ বন্ধুগণ, আজ উপোসথ দিবস। উপোসথ-ব্রত-পালনে ব্রতী হউন।'

এভাবে জন্ম-জন্মান্তরে বোধিসত্ত্ব বিভিন্ন যোনিতে জন্ম নিয়ে চন্দ্রের আকার দেখে উপোসথ (অষ্টমী, চতুর্দশী বা পঞ্চদশী) তিথি নির্দ্ধারণ করে ধর্মাচরণ করতেন। ঐ বোধিসত্ত্ব তাঁর পরবর্তী জীবনে বোধিসত্ত্ব সিদ্ধার্থরূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং মহাভিনিষ্ক্রমণের পর সর্বজ্ঞতা প্রাপ্ত হন। বুদ্ধ হয়ে পঁয়তাল্লিশ বছর বুদ্ধচর্যা-পালন করে বিশ্ববাসীর অসীম উপকার করেছেন।

চাঁদ যে আকারেই দেখা যাক্ না কেন তা জীবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জীবের বিশেষত শান্তিকামী মানুষের হৃদয়ে ক্ষণিকের তরে হলেও শান্তির ছোঁয়া দিয়ে যায়। বিভিন্ন আকারে দৃশ্যমান চন্দ্রের রূপের মধ্যে তার পরিপূর্ণ গোলাকার

রূপটিই সর্বাধিক নয়নাকর্ষক ও মনমোহক হয়। তার নয়নাভিরাম রূপে জীবের রূপ তো মনমোহক হয়ই, প্রকৃতিও অপরূপা হয়ে উঠে। ষোল কলায় পূর্ণ পূর্ণিমা তিথির চন্দ্রের পূর্ণাকারের অনুপম দিব্য রূপ দেখে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা দর্শক-মাত্রেরই হৃদয়ে পূর্ণতা প্রাপ্তির অসীম আনন্দের আভাস দিয়ে যায়। এক নির্জীব পিণ্ডবৎ ধূসর মরুভূমি হয়েও চাঁদ যদি পরের (অর্থাৎ সূর্যের) ধার করা আলোয় এত অপরূপা হতে পারে, তবে জীব তার জীবনকে নিজ চরিত্রগুণে আর নিজ জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করতে পারলে তা তার কাছে কত না আনন্দদায়ক হতো? এ জিজ্ঞাসা নিশ্চয়ই পূর্ণচন্দ্র-দর্শকের মনে জাগে। শুধু তা নয় চন্দ্রের দর্শনে জীবের জীবনে প্রাপ্ত বা পরমার্থ প্রাপ্তির আশাও উদ্দীপিত। একথার সত্যতা বুদ্ধ-পূর্ণিমায় বোধিসত্ত্ব তাপস সিদ্ধার্থের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির ঘটনা হতে সিদ্ধ হয়।

একবারের ঘটনা এক উপোসথ দিবসে শশ তাঁর তিন বন্ধুকে ডেকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন- 'বন্ধুগণ, আজ উপোসথ দিবস। উপোসথ-ব্রত পালনে ব্রতী হতে হবে সবাইকে। যাচক এলে তাকে দান দিতে হবে।' উপদেশ শুনে তিন বন্ধুর প্রত্যেকে নিজ নিজ অন্ন হহতে কিছু দেবার সংকল্প নেন। শশও বসে চিন্তা করতে থাকেন-- আমি কি দিব? আমি তো ঘাস-পাতা খাই। ঘাস-পাতা কিছুতেই যাচককে দেয়া যাবে না। বার বার চিন্তা করার পর সে সংকল্প গ্রহণ করে- 'কোন যাচক এলে আমি তাকে আমার শরীর দান করবো।' বোধিসত্ত্ব শশের অটুট সংকল্পে দেবরাজ ইন্দ্রের আসন উত্তপ্ত হয়। এর কারণ অনুসন্ধান করলে তিনি জানতে পারেন- বোধিসত্ত্ব শশের দান করার সংকল্পে আমার আসন উত্তপ্ত হয়েছে। আর কালবিলম্ব না করে দেবরাজ ইন্দ্র দেবলোক হতে অন্তর্ধান হয়ে মনুষ্যলোকে শশের সম্মুখে ব্রাহ্মণ-বেশী যাচকরূপে আবির্ভূত হন। ঐ ব্রাহ্মণ শশের কাছে কিছু অন্ন দান চান। সংকল্পপূর্তির সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে শশের তো আনন্দের সীমা ছিল না। বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে শশ যাচককে বলেন- 'কিছু খড়কুটো সংগ্রহ করে তা দিয়ে আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা করুন।' ব্রাহ্মণ যাচকও শশের কথা মতো খড়কুটো সংগ্রহ করে তা দিয়ে আগুন জ্বালান। আগুন জ্বলতে দেখে শশ কিছু দূরে গিয়ে নিজ শরীরকে তিনবার ঝাঁকান। শরীর ঝাঁকানোর সময় দশ-পারমিতা পূর্তির উদ্দেশ্যে চিন্তা করেছিলেন- 'আমার ব্যক্তিগত কারণে আমার

শরীরের লোমে বসবাসকারী নিরীহ নিরপরাধী কীটসমূহ যেন অকাল-মৃত্যু প্রাপ্ত না হয়। কোন কারণে আমার শীল যেন না ভাঙ্গে।" এভাবে শীলে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে শশ আগুনে ঝাঁপ দেন। আগুনে ঝাঁপ দেওয়া সত্ত্বেও তাঁর শরীরের একটি লোমও জ্বলে নি দেখে আশ্চর্য- চকিত হন। ব্রাহ্মণ-যাচককে ডেকে শশ বলেন- হে ব্রাহ্মণ, এ কেমন আগুন জ্বালিয়েছেন আপনি? এতো একেবারে হিমঘরের ন্যায় শীতল। এরপর ব্রাহ্মণ বলেন- 'আমি ব্রাহ্মণ নই। আমি দেবরাজ ইন্দ্র। আপনার অধিষ্ঠান পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে এসেছি। আপনাকে সংকল্পে অটুট দেখে আমি অতীব প্রীত। আপনার এ অটুট সংকল্প-শক্তির যশোগাথা কল্পকাল জগত-বিশ্রুত হউক কামনা করি।' দেবরাজ ইন্দ্র চন্দ্রে শশাকৃতি এঁকে দেন। পৃথিবীবাসীর কাছে ঐ শশাকৃতি প্রতিটি পূর্ণিমা তিথির পূর্ণ-চন্দ্রে দৃষ্ট হয়। পূর্ণচন্দ্রে অংকিত শশাকৃতি অজানা কাল হতে পৃথিবীবাসী জীবসমূহকে শশের ন্যায় অটুট ও নিষ্কলঙ্কিত ধর্ম-জীবন যাপনের এবং জীবনের পূর্ণত্ব প্রাপ্তির প্রেরণা দিয়ে আসছে। কল্পকাল তা করে যাবে।

মট্‌ঠকুণ্ডলী-জাতকের (J. 449) ঘটনাটিও এখানে উল্লেখযোগ্য। এর উল্লেখ পালি-সাহিত্যের অন্য স্রোত ধর্মপদে ও (J. 449) ধর্মপদের অর্থকথা (DhA.i. 20ff), **বিমানবত্থু** (Vv. 9) ও **বিমানবত্থু অট্‌ঠকথাতে** (VvA. 322) রয়েছে।

ঘটনাটি শ্রাবস্তীর এক সম্ভ্রান্ত অথচ ভারী কৃপণ ব্রাহ্মণ পরিবারের। সে কাউকে কোনদিন কিছু দেয় নি, তাই ব্রাহ্মণ-গৃহপতির নাম হয়েছিল অদিন্ন-পূর্বক। তার ছিল একটি ছেলে। ঐ ছেলে মাতা-পিতার নয়নের তারা। পিতার একবার ইচ্ছে হয়েছিল ছেলেকে কিছু উপহার দেবে। শেষে সিদ্ধান্ত নেয় সে ছেলেকে সোনার কুণ্ডল দেবে। স্বর্ণকারকে তা বানাতে দেওয়া হলে পারিশ্রমিকরূপে তাকে অযথা অনেক অর্থ ব্যয় করতে হবে ভেবে গৃহপতি পিতা নিজেই সোনার পাত পিটিয়ে পিটিয়ে ছেলের জন্যে একজোড়া কুণ্ডল বানিয়েছিল। ঐ কুণ্ডলী ধারণ করায় বন্ধু-বান্ধবের কাছে ঐ ছেলে **মট্‌ঠ-কুণ্ডলী**-রূপে পরিচিত হয়। ষোল বছর বয়সে ঐ ছেলে একবার পাণ্ডুরোগে আক্রান্ত হয়। চিকিৎসায় অযথা কষ্টার্জিত অর্থ ব্যয় হবে ভেবে ঐ গৃহপতি ডাক্তার-বৈদ্যকে ডাকান নি। এমন কি যথোচিত যত্ন নেন

নি। দর্শনার্থীদের কেহ জিজ্ঞেস করলে এ গৃহপতি ব্রাহ্মণ উত্তর দিতেন- 'এমন হয়ে থাকে। কয়েকদিন গত হলেই পুত্রের স্বাস্থ্যোদ্ধার আপনা-আপনি হয়ে যাবে।' যত্ন ও চিকিৎসার অভাবে পুত্র মরণাসন্ন হয়। এবার পুত্রের এ মরণাবস্থায় পিতাকে একটু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখা যায়, তবে তার এভাবনা মূলত পুত্র-প্রেমে নয়। তার দুশ্চিন্তার কারণ ছিল- স্বার্থ-চিন্তায়। মরণাসন্ন পুত্রের দর্শনার্থীদের সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে চলেছিল। এভাবে দর্শনার্থীরা ঘরে আসা আরম্ভ করলে তার সঞ্চিত গোপন বৈভব-সম্পত্তির কথা আর গুপ্ত থাকবে না। লোকে সব জেনে ফেলবে। চুরি-চামারির সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। আসলে সম্পত্তি হাতছাড়া হবার আগাম দুর্ভাবনায় পিতার দুশ্চিন্তার মাত্রা বেড়েই চলেছিল। এ দুশ্চিন্তা হতে মুক্তি পাবার এক ফন্দি আঁটে ঐ ব্রাহ্মণ গৃহপতি। একদিন সে তার মরণাসন্ন পুত্রকে ঘরের বাইরের উঠোনে সামান্য একটি চাদর পেতে শুইয়ে দেন। দর্শনার্থীরা এর কারণ জানতে চাইলে কৃপণ পিতা বলতেন- বাইরের মুক্ত পরিবেশে ছেলের মন প্রসন্ন থাকবে।

এদিকে ছেলের প্রাণ কণ্ঠাগত প্রায়। প্রায় সময়ই ছেলের চোখ বন্ধ থাকে। বেশীক্ষণ চোখের পাতা মেলে রাখার শক্তিও তার মধ্যে নেই।

মহাকারুণিক ভগবান বুদ্ধ তাঁর প্রতিদিনের নিয়ম মত দিব্যদৃষ্টি প্রসার করে জানতে চান- 'আজ তিনি কার বিশেষ উপকার করতে পারবেন?' দিব্যদৃষ্টিতে দেখেন- ঐ মরণাসন্ন বালককে। প্রাণ-দীপ তার নিভু নিভু প্রায়। অনুকম্পাবশত শাস্তা ঐ বালকের অতীত জন্মের সঞ্চিত পুণ্যকর্ম ও ওসবের সম্ভাব্য কুশল-বিপাকের (সুখ) বিশ্লেষণ করেন। আর জানতে পারেন- এ বালক এ জন্মে এমন কোন বলশালী পুণ্যকর্ম করে নি যার আশু সুপরিণামে সে মৃত্যুর পর সুগতি পেতে পারে। বর্তমান পূণ্যকর্মের আধার না থাকায় অতীত-জন্মের পূণ্য তার আশু কুশল-বিপাক (অর্থাৎ সুগতি) দানের সুযোগ পাচ্ছে না। একারণে মরণাসন্নকালের শারীরিক-মানসিক পীড়া ঐ বালকের মনকে বিক্ষিপ্ত করে তুলবে ও বিষিয়ে দেবে। পরিণামে তার দুর্গতি প্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। এ মূহুর্তে ঐ বালক যাতে এক বলশালী পূণ্যকর্ম সম্পাদন করতে পারে এমন এক সমুচিত পরিবেশ তৈরী করাতে হবে তার জন্যে। আর কালবিলম্ব না করে শাস্তা দিব্য-শক্তি প্রয়োগের

মাধ্যমে এ মরণাসন্ন বালকের দৃষ্টিপথে পড়েন মতো বালকের বাড়ীর সামনের পথের পথিক হন।

তথাগত বুদ্ধের দিব্যরূপ দৃষ্টিপথে পড়তেই বালকের মনে অপার প্রীতিভাবের সঞ্চার হয়। বুদ্ধের প্রতি তার মন শ্রদ্ধাপ্লুত হয়। করজোড়ে নমস্কার করার দৈহিক শক্তিও তার নেই। তাই সে মনে মনে তথাগত বুদ্ধের প্রতি নমস্কার জানায়। বালকের মুখমণ্ডল হতে রোগজনিত পীড়ার ছাপ একেবারে মিটে যায়। তার স্থলে এমন অভূতপূর্ব প্রসন্নতার ছাপ মুখমণ্ডলে ফুটে উঠে যা দেখে দর্শনার্থীর মনে হতো ঐ বালক যেন এখনি এক গভীর সুখ-নিদ্রায় শুয়েছে। মৃত্যুর পর ঐ বালক সুগতি প্রাপ্ত হয়। সে দেবলোকের এক বিমানে দেবপুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করে। এর পর শাস্তা তাঁর গন্তব্য স্থলে চলে যান।

মৃতদেহের পাশে বসা ঐ বালকের পিতা তার পুত্রের মুখ-মণ্ডলের ঐ আকস্মিক পরিবর্তন এক নাগাড়ে লক্ষ্য করে যাচ্ছিলেন। তা তাকে বিস্ময়াভিভূত করেছিল অনেকটা। বেশ কিছুক্ষণ পর বিস্ময়াবেশ কেটে ওঠার পর পিতা তার পুত্রের মৃতদেহকে শ্মশানে নিয়ে যান। শেষকৃত্য সমাপনকালে আবেগ সামলাতে না পেরে মৃত বালকের পিতা বুক চাপড়ে চাপড়ে কাঁদতে থাকে। পশ্চাত্তাপ করে নিজের দোষের কথা আওড়াতে থাকে।

অন্যদিকে দেবলোকে দেবপুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করার পর ঐ দেবপুত্র কোন্ কারণে ও কোত্থেকে দেবলোকে উৎপন্ন হলেন চিন্তায় মগ্ন হন। ঐ চিন্তনকালে দেবপুত্র তার মানবকুলের পিতাকে (অদিন্নপূর্বক) তার চিতার পাশে বসে বিলাপ-রত অবস্থায় দেখেন। এভাবে অযথা কালক্ষেপন করতে দেখে দেবপুত্রের মনে দয়া উৎপন্ন হয়। তার পূর্ব পিতাকে সদ্বুদ্ধিদানের এক অভিনব উপায় অবলম্বন করেন।

ঐ দেবপুত্র মট্ঠকুণ্ডলীর রূপ ধারণ করে শ্মশানভূমি হতে তার পিতার বাড়ী ফিরে যাবার পথে একপাশে রথের ভাঙ্গা চাকা হাতে নিয়ে কাঁদার ভান করে। **মুট্ঠ-কুণ্ডলীকে** (দেবপুত্র) কাঁদতে দেখে শোকার্ত ব্রাহ্মণ-পিতা তার কাছ হতে এভাবে কাঁদার কারণ জানতে চান। রথচালকের বেশধারী **মুট্ঠকুণ্ডলী** উত্তরে বলেন- 'আকাশের চাঁদ (পূর্ণচন্দ্র) হাতে পেলে তা দিয়ে রথের ভাঙ্গা চাকা

বদলাতাম।' উত্তর শুনতেই অদিন্নপূর্বক না হেসে পারে নি। পুত্রমোহ ও পুত্রবিয়োগজনিত বিষন্নভাব কাটিয়ে উঠে তিনি উচ্চস্বরে হেঁসে ফেলেন। রথচালককে বোঝানোর মুদ্রায় অদিন্নপূর্বক বলেন- 'বসে বসে কাঁদলে কি চাঁদ হাতের মুঠোয় আসবে? এভাবে কাঁদাটা তো মুর্খের লক্ষণ।'

রথচালকও এবার অবসর বুঝে প্রসন্ন মুদ্রায় প্রাক্তন পিতাকে (অদিন্নপূর্বক) বুঝিয়ে বলেন- 'প্রাণীর কাল-গতি প্রাপ্ত হওয়াটা একটা স্বাভাবিক ঘটনা। না মরে কেহ অমর থাকে না। একবার মারা গেলে মৃত ব্যক্তি তার পূর্বের বাস্তবিক জীবনে ফিরে আসে না। যাকে চোখে দেখা যায় না, আর যার ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই তার জন্যে কাঁদাটা তো মহামূর্খতার লক্ষণ। আমি যে চাঁদের জন্যে কাঁদছি তার দিব্যরূপ তো অন্ততপক্ষে দেখা যাচ্ছে।

ঐ রথচালকের (দেবপুত্র) তর্কসঙ্গত কথার শৈলীতে ও চন্দ্রের উপমায় গৃহপতির মনে সদ্বুদ্ধি জাগে। পুত্রমোহ ও পুত্রবিয়োগজনিত শোকাচ্ছন্ন পিতার মন মূহুর্তে শোকমুক্ত হয়। শোকমুক্ত মনে আশ্বস্ত হয়ে ঐ গৃহপতি রথচালককে তার সদ্বুদ্ধিদানের জন্যে ধন্যবাদ জানায়। গৃহপতি তার বাসস্থানে ফিরে যায়। রথচালকরূপী দেবপুত্রও স্বস্থানে ফিরে যান। পরদিন অদিন্নপূর্বক ভগবান বুদ্ধকে নিজ বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে এনে স্বহস্তে অন্নদান করে। ভোজনান্তে ঐ গৃহপতি শাস্তাকে জিজ্ঞেস করেন- কেবলমাত্র শ্রদ্ধার কারণে কি কেহ দেবকুলে জন্মগ্রহণ করতে পারে? শাস্তা এর উত্তবে বলেন- 'সম্ভব'। শাস্তা তাঁর উপদেশকে অধিক প্রভাবশালী করে তোলার এবং গৃহপতির মনে শ্রদ্ধা উৎপন্ন করানোর জন্যে ঐ দেবপুত্রকে (মট্ঠকুণ্ডলী) সংকেত দেন। সংকেত পাওয়া মাত্র ঐ দেবপুত্র শাস্তার পাশে করজোড়ে আবির্ভূত হন। শাস্তার উপদেশকে অনুমোদন করেন। ঐ দেবপুত্রের সাক্ষ্যদানে ঐ গৃহপতির মনে শাস্তার প্রতি প্রগাঢ় আস্থা ও শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। তথাগত-প্রমুখ ভিক্ষু-সংঘকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানিয়ে সহস্তে আবারও অন্নদান করেন। ঐ সময় আবার ঐ দেবপুত্র ঐ গৃহপতির বাসস্থানে উপস্থিত হন। তার প্রেরণায় গৃহপতি ত্রিশরণাগত উপাসক হন। শাস্তার উপদেশ শুনে গৃহপতি স্রোতাপত্তি-ফলে প্রতিষ্ঠিত হন।

চন্দ্রাভা-জাতকে (১৩৫ নং) **'চন্দ্রাভা'র** (চন্দ্রকিরণ) উপযোগিতার এক গুরুত্বপূর্ণ সূচনা লিপিবদ্ধ রয়েছে। একবার বোধিসত্ত্ব মানবকুলে জন্মগ্রহণ করে একজন প্রখ্যাত ঋষি হয়েছিলেন। তাঁর শিষ্য সংখ্যা ছিল অনেক। এক শিষ্যের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি তাঁর মৃত্যুকালে 'চন্দ্রাভা' ও 'সূর্যাভা' শব্দ দুটি মাত্র উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন। তাঁর প্রধান শিষ্য এ শব্দ দুটির সঠিক অর্থ বোঝানোর প্রয়াস করছিলেন। কিন্তু তাঁর সব প্রয়াসই ব্যর্থ যাচ্ছিল। শ্রোতারা তাঁর ব্যাখ্যা মেনে নিতে পারছিলেন না।

অন্যদিকে ঐ বোধিসত্ত্ব মৃত্যুর পর দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মনুষ্যলোকে তাঁর শিষ্যদের অবস্থা জানার উদ্দেশ্যে দিব্য শক্তির প্রয়োগ করেন। শিষ্যের কথা কেহ বিশ্বাস করছে না দেখে তিনি নিজে দিব্য দেবরূপে মধ্যাকাশে আবির্ভূত হন। সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে ঋষিরূপে মৃত্যুকালে উচ্চারিত 'চন্দ্রাভা' ও 'সূর্যাভা' শব্দ দুটির মর্মার্থ বুঝিয়ে বলেন। যে সাধক বা সাধিকা চন্দ্র বা সূর্যকে অর্থাৎ তা হতে বিচ্ছুরিত আলোকে কেন্দ্র করে সমাধিস্থ হন তিনি মৃত্যুর পর আভাস্বর দেবলোকে দিব্য আভামণ্ডিত হয়ে জন্মগ্রহণ করেন (J. 1.474)।

এভাবে দেখতে পাই চন্দ্র নিজে নির্জীব হওয়া সত্ত্বেও তার রূপের বা আকারের কারণে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষে জীবের আত্মোত্থানে বিশেষত আধ্যাত্মিক বিকাশে সহায়ক হয়।

পূর্ণচন্দ্র বা চন্দ্র এক হলেও তাকে তার উদয়ের তিথি এবং ঐ তিথিতে উপলব্ধ প্রভাবোৎপাদক নক্ষত্রের নামানুসারে নামাংকিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বৈশাখী পূর্ণিমা নামের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। বিশাখা একটি নক্ষত্রের নাম। বছরের যে মাসে বিশাখা নক্ষত্রের প্রভাব চরমতা প্রাপ্ত হয় তাকে ঐ নক্ষত্রের নামানুসারে নামাংকিত করা হয়- তাই এই মাসের নাম 'বৈশাখ মাস'। পালি সাহিত্যে এ মাস **'বেসাখ মাস'** নামে অভিহিত হয়। বৈশাখ মাসের যে তিথিতে চন্দ্র তার পূর্ণাকারে দৃষ্ট হয় তাকে 'বৈশাখী পূর্ণিমা' তিথি বলা হয়। অনেকে বৈশাখ মাসের পূর্ণচন্দ্রকে সংক্ষেপে 'বৈশাখ পূর্ণিমা' বলে থাকেন। ব্যাকরণগত দৃষ্টিতে তা ভুল হলেও সামান্য জন-জীবনে এ প্রয়োগ চলে।

বছরের আর অন্য এগারটি মাসের নামকরণ করা হয়, যেমন- জৈষ্ঠ্য, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র। এদের পালি নাম যথাক্রমে এরূপ- বেসাখ, জেট্‌ঠ, আসাল্‌হ, সবণ, ভদ্দ, অস্‌সযুজ, কত্তিক, অগ্গহায়ণ, ফুস্‌সো, মাঘ, ফগ্গুন, চিত্ত। (Abhpd. P 53)

মহাকারুণিক তথাগত বুদ্ধ ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত অনুত্তর সংঘের ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীর জীবনী ও বাণী পালি সাহিত্যের মূলাধার। এমন সব মহাপুরুষগণের ঐতিহাসিক ঐতিহ্যমণ্ডিত অবদান-গাথায় সমৃদ্ধ এ পালি সাহিত্য। তাঁদের জীবনের পরম লক্ষ্য প্রাপ্তি এবং আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা সিঞ্চিত বাণীর মূল্যায়ণে পালি সাহিত্যের মূল্যায়ণ হয়।

এমন মহাপুরুষগণের জীবনের অনেক ঘটনাই বছরের কোন না কোন পূর্ণিমায় অবশ্যই ঘটেছে। এ নিবন্ধে স্থানাভাবের কারণে কেবল ভগবান বুদ্ধের জীবনে পূর্ণিমা প্রসঙ্গমাত্রটি এখানে উল্লেখ করা হল।

ভগবান বুদ্ধের জন্ম হতে তাঁর মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্তির কাল অবধি সুদীর্ঘ আশি বছরের সম্পূর্ণ ঘটনাবলী মূল পালি সাহিত্যের কোথাও ক্রমবদ্ধভাবে একত্রে লিপিবদ্ধ নেই। তা তো দূরের কথা, তাঁর জীবনের যে ঘটনাগুলো উপরোক্ত পূর্ণিমা তিথিগুলোতে ঘটেছিল তার ক্রমবদ্ধ পূর্ণ বিবরণও পালি সাহিত্যে নেই। অন্য আধুনিক যুগের আধুনিক কোন ভাষায় এমন বিবরণী-যুক্ত সাহিত্য রচিত হয়েছে এমন সূচনা আমাদের জানা নেই। কয়েকটি বাদে উপরোক্ত পূর্ণিমা তিথিগুলোতে বুদ্ধের জীবনে ঘটেছে এমন পনের ষোলটি ঘটনার উল্লেখ সচরাচর পাওয়া যায়। এদের অধিকাংশতই বৈশাখী পূর্ণিমা ও আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে হয়েছে বলে বর্ণিত হয়। বৌদ্ধদের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে এ দুটি পূর্ণিমা তিথিকে বা এ দুই তিথির পূর্ণচন্দ্রকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেবার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়।

বৌদ্ধ ধর্মের দুই প্রধান শাখা শ্রাবকযান ও মহাযান। দুই শাখার সাহিত্যে, বিশেষত বিনয় সম্বন্ধিত সাহিত্যে মাসের দুই পক্ষের (শুক্ল ও কৃষ্ণ) চারটি তিথি

(অষ্টমী, চতুর্দশী বা পঞ্চদশী) উপোসথ-দিবসরূপে মান্যতা দিয়ে ধর্মীয় গুরুত্ব প্রদান করার এক সুব্যবস্থিত, ব্যবহারিক ও ঐতিহ্যমণ্ডিত পরম্পরার উল্লেখ পাই।

গৃহীদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক জীবনে সুখ, শান্তি, প্রগতি প্রাপ্তি মাঙ্গলিক মৈত্রী, করুণা, মুদিতাদি সদ্ভাবনা প্রসারের উদ্দেশ্যে, তথাগত বুদ্ধকে দান, শীল ও ভাবনাদি অনুশীলনের উপদেশ দিতে পাই। শাস্তার সাথে তাঁর প্রতিষ্ঠিত অনুত্তর সংঘের সদস্য-সদস্যাকেও (ভিক্ষু-ভিক্ষণী) একই প্রকারের উপদেশ দিতে পাই। সংঘীয় জীবনকে সুব্যবস্থিত, দীর্ঘস্থায়ী ও পরিশুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে উপোসথ- দিবসে সীমায় সমবেত হবার, প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তি করার, ধর্মদেশনা দেবার নির্দেশ শাস্তা নিজেই কয়েক পর্যায়ে দিয়েছেন।

অনুত্তর সংঘের সদস্য-সদস্যাগণের সংঘীয় জীবনের দৈনন্দিন দিনচরিয়ার 'ক্ষমা-যাচনা'র এক বিশেষ বিধি ও মাহাত্ম্য রয়েছে। বয়কনিষ্ঠরা বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছে গিয়ে স্বেচ্ছায় ক্ষমা-যাচনা করে বলেন- 'ভন্তে, জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে দ্বার-ত্রয়ে (কায়, বাক্য, মনে) কৃত সব অপরাধ ক্ষমা করুন।' বিশেষ মুদ্রায় ও বিধিতে এ ক্ষমা-যাচনা করতে হয়। বৌদ্ধ গৃহী-সমাজেও এ বিধি ও পরম্পরা আজও জীবিত আছে।

এ ক্ষমতা যাচনার উত্তরে ক্ষমা দান দিয়ে বয়োজ্যেষ্ঠগণ বলেন- 'ক্ষমা করলাম, ক্ষমা করলাম তোমার সব অপরাধ।' এতই বয়ো-জ্যেষ্ঠগণ ক্ষান্ত হন না। ক্ষমা চেয়ে কনিষ্ঠরা যদি উদারতার পরিচয় দিতে পারেন, বয়োজ্যেষ্ঠরাও উদারতা দর্শাতে পিছিয়ে থাকেন না। ক্ষমাদানের সাথে মন উজার করে আশীর্বাদও দেন। আশীর্বাদ দিয়ে বলেন---

অভিবাদনসীলিস্স নিচ্চং বুড্ঢাপচায়িনো।
চত্তারো ধম্মা বড্ঢন্তি আয়ু বণ্ণো সুখং বলং।।
ইচ্ছিতং পত্থিতং তুয়্হং খিপ্পমেব সমিজ্ঝতু।
পূরেন্তো সব্ব-চিত্ত-সংকপ্পো চন্দো পন্নরসো যথা।।

ধম্মপদ গাথা -- ১০৯

আয়ু, বর্ণ, সুখ, বল সম্পন্ন জীবনই সার্থক জীবন ও সফল জীবন। যারা বৃদ্ধদের

নিত্য অভিবাদন (পূজা-সৎকার, সেবা-শুশ্রুষা করেন তাদের জীবনে উপরোক্ত চারটি আবশ্যক ধর্ম (সম্পত্তি) নিরন্তর বাড়ে।

সাথে তিনি আরো বলেন---

পঞ্চদশীর (পূর্ণ) চন্দ্রের ন্যায় তোমার ঈপ্সিত ও প্রার্থিত সব মনোকামনা শীঘ্রাতিশীঘ্র পূর্ণ হউক।

আশীর্বাদক তাঁর আশীর্বচন দান কালে মন-প্রাণ উজাড় করে এমন ভাবে আশীর্বাদ দিতে চান যেন ক্ষমাপ্রার্থী বা আশীর্বাদপ্রার্থীর সব কামনা পূর্ণ হয়, আর তার জীবনে যেন কোন কিছুর অভাব বোধ না হয়। পূর্ণ-চন্দ্রের উপমা-দান ছাড়া আশীর্বাদক যেন তার অনুপম, অসীম, নির্মল সৎকামনার ভাবনা অন্য কোন শব্দে ব্যক্ত করতে পারেন না।

সংঘ সশক্তিকরণের উদ্দেশ্যে যুবক-যুবতীদের প্রেরণা দিয়ে শাস্তা বলেছিলেন-

যো হবে দহরো ভিক্খু যুঞ্জতি বুদ্ধসাসনং।
সো ইমং লোকং পভাসেতি অব্ভা মুত্তো'ব চন্দ্রিমা।

ধম্মপদ গাথা -- ৩৮২

এ গাথার মাধ্যমে জীবনে যুবশক্তির সদুপয়োগের মাহাত্ম্যকথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে শাস্তা বলতে চেয়েছিলেন- এক জ্ঞানী যুবক বা যুবতী যদি তার ভরা যৌবনে নির্মল বুদ্ধের শাসনে যুক্ত হয়ে পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য প্রকাশে রত থাকেন, তবে তিনি মেঘমুক্ত শারদীয় নীলাকাশে উদিত পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় সারা বিশ্বকে উদ্ভাসিত করতে পারবেন।

সূর্যালোকে এ লোক আলোকিত হলেও অধিককাল বর্তালে তা জীবের অসহনীয় হয়ে পড়ে, আর অশান্তির কারণ হয়ে পড়ে। গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্নকালীন সূর্যালোক কখনই জীবের মনোরঞ্জন করতে পারে না। অন্যদিকে মেঘমুক্ত নীলাকাশের পূর্ণচন্দ্র নিজে মনমোহক হয়। তার আলোকচ্ছটায় প্রকৃতি ও এর প্রতিটি বস্তু রমণীয় হয়ে পড়ে। মধ্যরাতে চন্দ্র তার দিব্য আভায় সমগ্র জীব-জগতকে মনোরঞ্জন করে। তাই উপরোক্ত গাথায় সূর্যালোকের চেয়ে চন্দ্রলোকের মহিমাকে

অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সূর্য উগ্রতার প্রতীক। চন্দ্র শীতলতা, স্নিগ্ধতা, করুণা ও মৃদুতার প্রতীক। প্রকৃতি ও প্রকৃতিস্থ জীব ও উদ্ভিদ জগতের নিরন্তর বিকাশে চন্দ্র সূর্য দুইয়ের আবশ্যকতা রয়েছে। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তবে জীবজগতের মনোরঞ্জনে চন্দ্রের ভূমিকার তুলনা নেই। সন্তানের লালন-পালনে ও মনোরঞ্জনে মাতা-পিতার উভয়ের ভূমিকা থাকলেও মায়ের ভূমিকা অধিকতর প্রশংসনীয়। জীব-জগতের, বিশেষত সমগ্র মানব-সমাজের বিকাশে ও মনোরঞ্জনে চণ্ড স্বভাবের ব্যক্তির ভূমিকার চেয়ে বিনয়ী ও করুণাবান ব্যক্তির ভূমিকা অধিক প্রশংসনীয়। এ প্রসঙ্গে করুণাঘন তথাগত বুদ্ধের জীবনী এক জাজ্বল্যমান প্রমাণ। এ মূল্যবান শিক্ষা মূলত প্রকৃতির চন্দ্র-প্রকৃতি হতে পাই।

পিটক সাহিত্যের একাধিক সূত্রে বিশেষত রাহুলকে দেওয়া উপদেশ রাহুলোবাদ-সুত্তে শাস্তা বলেছেন - পৃথিবী, জল, অগ্নি, বা বায়ুতে বিদ্যমান গুণে গুণমণ্ডিত হবার চেষ্টা করো। ভিক্ষান্ন-সংগ্রহে, পারিবারিক-হিতে বা সামাজিক-হিতে বা আধ্যাত্মিক-হিতে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী গণকে গৃহস্থগণের সান্নিধ্যে যেতে হয়। শীল-পালনের উপদেশ দিতে গিয়ে অনেক সময় তারা শীললঙ্ঘন করে বসেন। শীললঙ্ঘনে আত্মশুদ্ধি ও সংঘশুদ্ধি দুই বিঘ্নিত হয়। সংঘশুদ্ধির পরিহানিতে সংঘশক্তি ক্ষীয়মান হয়। আর সংঘশক্তি ক্ষীয়মান হলে বুদ্ধ-শাসনের আয়ু ক্রমশ ক্ষীয়মান হয়। ধর্মকে চিরস্থায়ী করতে হলে ধর্মদেশক ভিক্ষু-ভিক্ষুণীগণকে চন্দ্রের ন্যায় নির্মল ও অনাসক্ত হয়ে গৃহস্থদের গৃহে যাবার শাস্তার পরামর্শের উল্লেখ সংযুক্ত-নিকায়ের চন্দূপম-সূত্তে (S.ii. 197 & M.A.i.14) রয়েছে। এ সূত্রে প্রশংসা পাবার উদ্দেশ্যে ধর্মোপদেশ দান করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

তথ্য বিশ্লেষণ: পালি সাহিত্যে চন্দ্র-স্তুতি-কথা কিছু বিশেষ সূত্রে চর্চিত হয়েছে। ওসবের কোনটিতে চন্দ্রকে দৃশ্য বিমানরূপে, আবার কিছুতে চন্দ্রবিমানবাসী চন্দ্র নামক দেবতারূপে বর্ণনা করা হয়েছে। চন্দ্র-বিমানের নিবাসী চন্দ্র-দেবতা নিজে অদৃশ্য হলেও জীবের কাছে সে চাইলে দৃশ্যমান হতে পারে। 'বিমান' সাধারণত সামান্য জীবের চোখে দেখা যায় না। বিমান-নিবাসী দেবতাদের ইচ্ছানুসারে তাও সামান্য জীবের দৃষ্টিগোচর হতে পারে। এ নিবন্ধে চর্চিত চন্দ্র মেঘমুক্ত হলে জীবের দৃষ্টিগোচর হয়। মেঘাচ্ছন্ন হলে চন্দ্র দেখা যায় না। আর যদি সূর্য ও

চন্দ্রের মাঝে পৃথিবী এসে যায় তবে ঐ পরিস্থিতিতে চন্দ্র জীবের দৃষ্টিগোচর হয় না। চক্ষুহীন জীবের কাছে চাঁদের অস্তিত্বের বা দিব্য-রূপের কোন মাহাত্ম্য নেই।

উপোসথ দিবসে উপোসথ-ব্রতাদি পালনের প্রসঙ্গে চন্দ্রকথা চর্চিত হলেও বুদ্ধদেশিত ধর্ম-বিনয়ের কোথাও একথা জোড় দিয়ে বলা হয় নি যে কোন এক আকার-বিশিষ্ট চন্দ্রের তিথিতে কর্মসম্পাদন করা হলে পূণ্য হবে, আর না হলে পাপ হবে। এমন কথা যদি বুদ্ধের উপদেশের কোথাও বলে হয়ে থাকে তবে তা বিরোধাভাস দোষে দুষ্ট হবে। বুদ্ধ-প্রবর্তিত সদ্ধর্মের ছয়টি পরিচায়ক লক্ষণ বা গুণ রয়েছে। তা হল-

স্বাক্খাতো ভগবতা ধম্মো, সন্দিট্ঠিকো, অকালিকো, এহি পস্সিকো, ওপনয়িকো, পচ্চত্তং বেদিতব্বো বিঞ্ঞূহীতি।

এ ছয়টি পরিচায়ক গুণের সংক্ষিপ্ত অর্থ এরূপ---

১। ভগবান বুদ্ধের প্রবর্তিত ধর্মে কোন প্রকারের রহস্য নেই। ত্রিপিটকে সংরক্ষিত বুদ্ধ-বাণীর সবই সুন্দরভাবে বিশ্লেষিত ও সুব্যাখ্যাত হয়েছে তথাগত সর্বজ্ঞ বুদ্ধের মাধ্যমে। তাঁর ধর্ম-বাণীতে সত্য ব্যতীত অন্য কিছুই ব্যাখ্যাত হয়নি। সত্য সবার কাছে উন্মুক্ত। কেহ দেখতে না পেলে তা তার দোষ নয়।

২। বুদ্ধ-প্রবর্তিত ধর্ম অনুশীলনের সুপরিণাম কেবল পরজন্মেই দৃষ্ট হয় তা নয়, এজন্মেও পাওয়া যায়। ধর্ম অনুশীলনের ফলাফল পেতে অনুশীলনকারীকে আগামী কালের প্রতীক্ষা করতে হয় না। আজ, আর এখনই, অনুশীলন করা মাত্রই অনুশীলনকারীর জীবনে তার সুফল অনুভূত হয়।

৩। বুদ্ধ-প্রবর্তিত ধর্ম (অষ্টাঙ্গিক মধ্যম-মার্গ) অনুশীলনের কোন নির্দিষ্ট কাল নেই। যে কোন কালে তা আচরণযোগ্য।

৪। বুদ্ধ-প্রবর্তিত ধর্মে অন্ধ-বিশ্বাসের কোন স্থান নেই। বুদ্ধ বলেছেন বলেই যে তা অন্ধভাবে বিশ্বাস করতে হবে এমন কোন শর্ত নেই। এ পথকে জীবনের অঙ্গরূপে অঙ্গীকার করার পূর্বে নানা দৃষ্টিতে এর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার প্রয়োজন

রয়েছে। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পূর্বে বোধিসত্ত্ব সিদ্ধার্থও তার অনুশীলিতব্য ধর্মকে নানাভাবে পরীক্ষা করেছেন। তিনি তাঁর অনুগামীদেরও **'এহি পস্সিকো'** হয়ে সত্যার্থী হবার সাহসিক আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি আরও স্পষ্ট করে বলেছেন - গ্রাহ্য ধর্মের কাছে এসে, নানা দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ কর, এর পর উপকারী মনে হলে তা গ্রহণ কর আর অনুপকারী মনে হলে তা বর্জন কর।

৫। ভগবান বুদ্ধ-প্রবর্তিত ধর্মের (অষ্টাঙ্গিক মধ্যম মার্গ) অনুশীলনে অনুশীলন-কারীর জীবনে কোন প্রকারের হানি হয় না, বরংচ তার ক্রমোত্তর ও নিরন্তর বিকাশ হয়।

৬। ভগবান বুদ্ধ-প্রবর্তিত ধর্মের অনুশীলনের সুফল বিজ্ঞজন মাত্রেরই অনুভূতির বিষয়। তা অজ্ঞানীজনের অনুভূতির বিষয় নয়।

উপরোক্ত ছয় প্রকার লক্ষণ বা পরিচায়কগুণের মধ্যে তৃতীয়টি (অর্থাৎ **অকালিকো ধম্মো**) এ প্রসঙ্গে নিতান্তই উল্লেখনীয়। বুদ্ধের ধর্ম বলতে 'শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা'ময় অষ্টাঙ্গিক (মধ্যম) মার্গ বোঝায়। 'শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা'র পূরক অঙ্গের (সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্ বাণী, সম্যক্ কর্ম, সম্যক্ আজীবিকা, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি) বা বুদ্ধ-কারক ধর্মের (দশ পারমী, দশ উপ-পারমী, দশ পরমার্থ-পারমী) নিরন্তর প্রয়াসের সুফলে অনুশীলনকারীগণ নিজ নিজ লক্ষ্যবিন্দুতে পৌঁছাতে পারেন। এ প্রয়াসের নিরন্তরতা যাতে কোন প্রকারে বিচ্ছিন্ন না হয় সেদিকে অনুশীলনকারী সত্যার্থীকে তীব্র সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। তথাগত বুদ্ধ তাঁর ধর্মকে **'অকালিকো'** না বলে যদি **'সকালিকো'** বলতেন, তা হলে তার অর্থ হতো তার ধর্মের পূরক অঙ্গ-গুলোর অনুশীলন কেবল কোন এক নির্দিষ্টকালে বা তিথিতেই করা সমীচিন। এবং ওসবের অনুশীলনের সুফল কেবল এক নির্দিষ্টকালে বা তিথিতেই উপভোগ্য। আর অবশিষ্ট অন্য কালে বা তিথিতে শত চেষ্টা সত্ত্বেও তার সুফল পাওয়া যায় না। এমন যদি হতো তবে কোন কর্মের অনুশীলনের নিরন্তরতা থাকতো না। অন্তরাল থাকলে ধর্মাচরণের বা কর্ম-সম্পাদনের প্রয়াস ব্যর্থ যেত। তাই বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির লক্ষ্যে বোধিসত্ত্বগণকে জন্ম-জন্মান্তর ধরে পারমিতা পূরণের প্রয়াস

করতে দেখতে পাই। জাতক-সমূহ সততার এরই অকাট্য সাহিত্যিক প্রমাণ।

ভগবান বুদ্ধ তাঁর পঁয়তাল্লিশ বছরের বুদ্ধচর্যাকালে অনেক পূণ্যকর্ম করেছেন এবং লোকহিতে অনেক ধর্মদেশনা দিয়েছেন। পূণ্য কর্ম করা হলে বা ধর্মদেশনা দান কালে বা তার পূর্বে তিনি কোন প্রকারের তিথি-বিচার করেননি। তিনি কোনদিন চিন্তে করেননি যে এ উপদেশ এ তিথির যোগ্য বা যোগ্য নয়। ধর্মোপদেশ-দানের পূর্বে ও ধর্মোপদেশ-দানকালে শ্রোতার মন-মানসিকতা, পরিবেশ ও তার পূর্বাপর কার্য-কারণ-জনিত পরিস্থিতির অনকূলতা সম্পর্কে শাস্তা অবশ্যই বিচার করতেন। একজন সুশিক্ষক ও সুদেশকের পক্ষে এমন করাটা নিতান্তই আবশ্যক। কর্মের ফল (সুপরিণাম) আজ না হয় কাল গৌতম বুদ্ধের জীবনে হয়ত পূর্ণিমা তিথিগুলোতে হয়েছে। ওগুলোকে কার্য-কারণ-জনিত কর্ম-বিপাকের অভিব্যক্তির সু-অবসররূপে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

তদুপরি এমন কোনকাল নেই যাতে কেবল পূণ্যকর্ম বা পাপকর্ম সম্পাদিত হয় বা হয় না। প্রতিটি কালে জীব তার ইহ বা পূর্ব জন্মার্জিত (পাপ বা পূণ্য) কর্মের বিপাক (ফলাফল) পৃথক পৃথক ভাবে ভোগ করে। আবার জীব তার জীবনের প্রতিটি পলে অনুভূত তিক্ত বা মধুর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নিত্য নতুন প্রেরণা নিয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বা জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে এমনকি তন্দ্রাবস্থায় বা স্বপ্নাবস্থায়ও সে পাপ বা পুণ্য কর্ম করে। এটা সত্য যে এক ব্যক্তি এক সময়ে একসাথে পাপ ও পূণ্য কর্ম করতে পারে না। তবে এক নির্দিষ্ট সময়ে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি পাপ ও পূণ্য কর্ম দুইই করতে পারে। প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিষয় হওয়ায় এতে দ্বিমত হবার প্রশ্নই উঠে না। একই মুহূর্তে কেহ কারও জীবন দান দেয়, আবার অন্য দিকে কেহ কারও জীবন নেয়। একই কালে কেহ কারও সম্পত্তি দান করে, আবার কেহ ঐ একই কালে কারও সম্পত্তি চুরি করে। একই পূর্ণিমা তিথিতে একদিকে কেহ অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন জগত ভেদ করে প্রজ্ঞার আলোকে উদ্ভাসিত হন, অন্যদিকে কিছু জীব অন্ধকারাচ্ছন্ন জগতে গভীর নিদ্রায় শুয়ে থাকে। চন্দ্রের এমন সব তিথিতেই দেবদত্ত ও মানবিকা চিঞ্চার ন্যায় প্রাণী অহরহ পাপকর্ম সম্পাদন করেছিল আর দুর্গতি প্রাপ্ত হয়েছিল। অন্যদিকে এমন সব তিথিতে আনন্দ, সারিপুত্র, মৌদ্গাল্যায়নাদি মহাশ্রাবকগণ অন্যান্য সুখ-সম্পত্তির সাথে

সুগতিও প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

সুগতি বা দুর্গতি প্রাপ্ত হওয়াটা তিথির উপর নির্ভর করে না, তা নির্ভর করে জীবের ভাল বা মন্দ কর্মের উপর। কর্মের নৈতিকতা বা ভাল-মন্দতা নির্ভর করে মূলত কর্মকর্তার মন-মানসিকতার উপর। মনমানসিকতার শুদ্ধিতা বা অশুদ্ধিতা নির্ভর করে কর্ম-কর্তার বা কর্ম-সম্পাদনের অনুকুল বা প্রতিকুল পরিস্থিতির উপর। প্রয়োজন শুধু বুদ্ধি, সাহস ও সততার প্রয়োগের মাধ্যমে অনুকুল বা প্রতিকুল পরিস্থিতি ও উপলব্ধ সামগ্রীর প্রত্যয় সদুপয়োগ করার। এছাড়া জীবের জীবনে পরমার্থ প্রাপ্তির আর কোন দ্বিতীয় উপায় নেই।

বৌদ্ধ দর্শন মতে ব্যক্তির অস্তিত্বে বিদ্যমান চিত্ত, চৈতসিক, রূপ ও নির্বাণকে জীবনের পরমার্থরূপে বর্ণনা করা হয়। এতে 'কালে'র নামোল্লেখ নেই। তবে সংবৃতি সত্যরূপে লোকাচারে কাল বা তিথির প্রয়োগ সর্বজনবিদিত। এ সংবৃতি-সত্যের প্রয়োগ শাস্তা নিজে লোক-কল্যাণার্থে করেছেন এবং ত্রিপিটকে উপলব্ধ সূত্র-সমূহের এমন সংবৃতি-সত্যের প্রয়োগের প্রচুর প্রমাণ রয়েছে। লোকাচারে প্রযুক্ত এ কাল-অবধারণাকে কেন্দ্র করে কালপঞ্জিকা, সূর্যঘড়ি, হাতঘড়ি, বর্ষপঞ্জি বা জ্যোতিষ শাস্ত্রাদি প্রয়োগের প্রচলন হয়েছে। সমাজের কিছু মানুষের আজও ধারণা রয়েছে ঘড়ির কাটায়, ওতে লেখা সংখ্যায়, বা ঘড়িতে অন্য কোথাও কালের অবস্থান রয়েছে। তা যদি হয় তবে প্রত্যেকের 'কাল' স্বতন্ত্র হয়ে পড়ে। আবার অনেকের ধারণা 'কাল' সার্বদেশিক। কিন্তু বাস্তবিকতায় প্রত্যেক দেশেরই কাল-গণনা অন্য দেশ হতে ভিন্ন হয়। তা হলে কালের সার্বজনীনতা কিভাবে সিদ্ধ হয়? তা সন্দেহাস্পদ হয়ে পড়ে।

উপরোক্ত চার পরমার্থের মধ্যে 'চন্দ্র'-বিমান বা চন্দ্র-দেবতার নাম নেই। তবে চার পরমার্থের তৃতীয়টি অর্থাৎ 'রূপ' বলতে ব্যক্তির আন্তরিক, বাহ্যিক ও পারিপার্শ্বস্থ দৃশ্য ও অদৃশ্য সব ভৌতিক তত্ত্বকে বোঝায়। এ দৃষ্টিতে 'চন্দ্র' 'রূপ'-পরমার্থ ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়। উপরোক্ত চার পরমার্থ ধর্মের মধ্যে প্রথম তিনটিকে 'সংস্কৃত-ধর্ম' ও শেষেরটিকে 'অসংস্কৃত-ধর্ম' সংজ্ঞা দেওয়া হয়। সংস্কৃত-ধর্ম পরিবর্তনশীল (অনিত্য ধর্মী) হওয়ায় তাকে জীবের জীবনের পরম প্রাপ্তব্য ধর্মরূপে স্বীকৃতি

দেওয়া হয় না। অসংস্কৃত-ধর্মকে (নির্বাণ) অপরিবর্তনশীল (নিত্য) ও দুঃখ-মুক্ত অবস্থা হওয়ায় জীবনের প্রাপ্তব্য একমাত্র পরম সুখ-পদরূপে বৌদ্ধ শাস্ত্রে বহুচর্চিত হয়েছে।

চন্দ্রে যেমন তিথি নেই, তেমনি তিথিতে চন্দ্র নেই। জড়ধর্মী হওয়ায় চন্দ্রের নিজস্ব কোন নৈতিক মূল্য নেই। চন্দ্র আপাতদৃষ্টিতে দিব্য আভামণ্ডিত মনে হলেও বস্তুত তা ধূসর মরুভূমি। তা কোন কারণেই জীবনের প্রাপ্তব্য হতে পারে না।

হাতে ঘড়ি রেখে বা তা দেখে ঘড়ির (কাল) বা জীবনের সদ্ব্যবহার করা যদি দোষাবহ না হয়, তবে চন্দ্রের আকার বা তিথি স্মরণ করে চন্দ্রের সদুপয়োগের মাধ্যমে জীবনের সদুপয়োগ করাটা কোন প্রকারেই নিন্দনীয় হতে পারে না। তাই অষ্টমী, চতুর্দশী বা পঞ্চদশী তিথিতে দানশীল ভাবনাদি উপোসথ-ব্রতাদি পালনের নির্দেশ বিনয়ের বিধানে শাস্তা দিয়েছেন। তিথির সদুপয়োগ করার সাথে জীবের আত্মবিকাশে চন্দ্র ও সূর্যের উপয়োগেরও নির্দেশ আমরা পালি সাহিত্যে পাই। জীবের চারপাশে প্রকৃতিতে (জড়-জগতে) অনেক গ্রহ-উপগ্রহ-নক্ষত্র রয়েছে। দূরস্থ নক্ষত্র টিম টিম করে জ্বলছে দেখা গেলেও ওসবকে কেন্দ্র করে মনকে সমাধিস্থ করা যায় না। অন্য সব নক্ষত্রের তুলনায় সূর্য নিকটতর হওয়ায় এর আলোকরশ্মি অত্যন্ত প্রখর ও উজ্জ্বল হয়। এ কারণে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের আলো মধ্যাহ্নকালীন সূর্যের আলো অপেক্ষা মৃদু হয়। এ কারণে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের আলোকে কেন্দ্র করে এক নিশ্চিত কালের জন্যে মনকে সমাধিস্থ করা যেতে পারে। চন্দ্রের বিশেষত পূর্ণ চন্দ্রের আলো শান্ত, স্নিগ্ধ ও মৃদু হওয়ার ওতে মনকে সহজে সমাধিস্থ করা যায় এবং অপেক্ষাকৃতভাবে অধিককাল সমাধিস্থ রাখা যায়। সমাধিস্থ জীবের আত্মবিকাশে ও পূর্ণতা দানে তা সর্বাধিক সহায়ক ও পূরক অঙ্গরূপে ভূমিকা পালন করে।

এ প্রসঙ্গে মিলিন্দপ্রশ্নে বর্ণিত নাগসেন ও মিলিন্দের মধ্যে চলা নিম্নলিখিত বার্তালাপ এখানে প্রসঙ্গিক হয়ে পড়ে -----

চন্দ্রের পাঁচ গুণ

রাজা মিলিন্দ - ভন্তে নাগসেন! চন্দ্রের পাঁচ গুণ গ্রহণীয় বলেছেন! ঐ পাঁচটি গুণ

কি কি?

অর্হৎ নাগসেন - মহারাজ! চন্দ্র শুক্লপক্ষে উদিত হয়ে ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। সেইরূপ, যোগসাধনারত ভিক্ষুর আচার, শীল, গুণ, ব্রতপরায়ণতা, ধর্মগ্রন্থের অধ্যয়ন ও অধিগম, ধ্যানানুশীলন, স্মৃতি-উপস্থান, ইন্দ্রিয় সমুহের সংযমতা, ভোজনে মাত্রাজ্ঞতা এবং জাগরণে তৎপরতায় উত্তরোত্তর বর্ধিত হওয়া উচিত। মহারাজ! ইহা চন্দ্রের প্রথম গুণ।

মহারাজ! পুনরায়, চন্দ্র উদার অধিপতি হয়। সেইরূপ, যোগ-সাধনারত ভিক্ষুর আপন ইচ্ছা-শক্তির প্রবল অধিপতি হওয়া উচিত। মহারাজ! ইহা চন্দ্রের দ্বিতীয় গুণ।

মহারাজ! পুনরায়, চন্দ্র রাত্রিকালে আত্মপ্রকাশ করে। সেইরূপ যোগসাধনারত ভিক্ষুর নির্জনবাসী হওয়া উচিত। মহারাজ! ইহা চন্দ্রের তৃতীয় গুণ।

মহারাজ! পুনরায় চন্দ্র বিমানের কেতু হয়। সেইরূপ যোগসাধনারত ভিক্ষু শীলের কেতু হওয়া বাঞ্ছনীয়। মহারাজ! ইহা চন্দ্রের চতুর্থ গুণ।

মহারাজ! পুনরায়, চন্দ্র অযাচিত ও অপ্রার্থিত হয়ে উদিত হয়। সেইরূপ, যোগ-সাধনারত ভিক্ষুর অযাচিত ও প্রার্থিতভাবে গৃহীকুলে উপনীত হওয়া উচিত। মহারাজ! ইহা চন্দ্রের পঞ্চম গুণ। সংযুক্ত-নিকায়ে দেবাতিদেব বুদ্ধ বলেছেন-

"ভিক্ষুগণ! নিত্য নবরূপে দেহ-মন করি সঙ্কোচন,
শিষ্টভাবে চন্দ্রতুল্য গৃহী-ঘরে কর গমনাগমন।"

(চন্দুপমসুত্ত, সংযুত্তনিকায়)

বিশ্লেষণ:

পালি সাহিত্যে চন্দ্রের উল্লেখ চন্দ্র-বিমান ও চন্দ্র-দেবতারূপে করা ছাড়াও আরেক প্রকারে হয়েছে। এর প্রমাণ স্বরূপ ধর্মপদ হতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত গাথার বিশ্লেষণ হতে স্পষ্ট হয়---

দিবা তপতি আদিচ্চো, রত্তিং আভাতি চন্দিমা,
সন্নদ্ধো খত্তিয়ো তপতি, ঝায়ী তপতি ব্রাহ্মণো,
অথ সব্বমহোরত্তিং বুদ্ধো তপতি তেজসা ।

ধম্মপদ গাথা-- ৩৮৭

এ গাথার মাধ্যমে বলা হয়েছে---

দিনে সূর্য তাপ দেয়। রাতে আভা দেয় চাঁদ। রক্ষা-কবচে সজ্জিত ক্ষত্রিয় চমকায়। ধ্যানের তেজে ব্রাহ্মণ চমকায়। কিন্তু বুদ্ধ তাঁর (পারমিতা) তপ-তেজে দিনরাত সারাক্ষণ চমকায়।

এ গাথার প্রথম পদে যে সূর্যের কথা বলা হয়েছে তা কেবল দিনের বেলায়, আর যে চন্দ্রের কথা বলা হয়েছে তা কেবল রাতের বেলায় চমকায়।

অনেকে এ সূর্যকে সূর্য-বিমান বা সূর্য-দেবতা, আর চন্দ্রকে চন্দ্র-বিমান ও চন্দ্র-দেবতা রূপে মেনে নেবার দাবী করতে পারেন।

এমন করা হলে যে ভুল করা হবে তা তথ্য-সমুহের বিশ্লেষণ একটু গভীরতার সাথে করলে স্পষ্ট হয়ে যাবে।

চন্দ্র-দেবতা ও সূর্য-দেবতা তাঁদের নিজ নিজ পূণ্যপ্রতাপে দিব্য আভামণ্ডিত হয়ে থাকেন। পালি সাহিত্যের কোথাও এমন কথা বর্ণিত হয় নি যে সূর্যদেবতা কেবল দিনে আর চন্দ্রদেবতা কেবল রাতে চমকায়। তাঁদের উভয়ের দেহ দিনরাত সব সময়ই চমকায়। এ ভূ-লোকের প্রাণীরা তাঁদের দৃষ্টিশক্তির অভাবে এদের দিব্য আভাযুক্ত দেহকে দেখতে না পান সেটা আলাদা ব্যাপার।

এরপরও অনেকে এ তর্ককে উপেক্ষা করে বলতে পারেন--- কেন! সূর্য-চন্দ্রও তো রাহুগ্রস্ত হলে আভাহীন, আর রাহু-মুক্ত হলেই আভাযুক্ত হয়। পালি সাহিত্য মতে ভগবান বুদ্ধের জীবদ্দশায় চন্দ্র ও সূর্য একবার রাহুগ্রস্ত হয়েছিলেন। তাঁর নির্দেশে তাঁরা রাহুমুক্তও হয়েছিলেন। এ ঘটনা তো ২৫৫৩ বছরেরও পূর্বের। এ সুদীর্ঘ কালের মধ্যবর্তী কালে এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছিল কিনা তার প্রমাণভিত্তিক তথ্য আজও অনাবৃত হয় নি।

উপরোক্ত গাথায় যে সূর্য ও চন্দ্রের কথা চর্চিত হয়েছে ওদুটির মধ্যে সূর্য দিনরাত সারাক্ষণ চমকালেও রাতে দেখা যায় না, কেবল দিনেই তাকে চমকাতে দেখা যায়, আর চন্দ্রকে কেবল রাতে চমকাতে দেখা যায়। উপরোক্ত বর্ণিত সূর্য ও চন্দ্রের চমকানোর ঘটনা কোন বিস্মৃত কালের ঘটনা নয়, এ তো নিত্যিকার ঘটনা। এ হতে স্পষ্ট হয় উপরোক্ত গাথায় চর্চিত সূর্য ও চন্দ্র সূর্য-বিমান ও এর নিবাসী সূর্য-দেবতা, এবং চন্দ্র-বিমান ও এর নিবাসী চন্দ্র-দেবতা এক নয়, তাঁরা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন।

সমাজে সূর্য-চন্দ্রের পূজা:

জীবের সৃষ্টির প্রারম্ভিক কাল হতে আত্মরক্ষা ও আত্মোত্থানের প্রয়াস চলছে নিরন্তর। নিজ বা নিজ সমাজের ব্যাপারে যে বা যারা যত সচেতন তার বা তাদের জীবনটা ততটা সুরক্ষিত এবং ততটা বিকশিত- এ কথা ইতিহাস সিদ্ধ। সমাজশাস্ত্রীদেরও একই মত। সমাজের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ সচেতন-শীলতার সুপরিণাম দেখা গেছে। দৃশ্য প্রাণীজগতের মানুষ অন্যাপেক্ষা অধিক সচেতনশীল প্রাণী হওয়ায় মানবের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে সচেতনতার সুপরিণাম অধিকমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। মানব নিজের ও তার ভাবী বংশধরদের হিতে ও স্বার্থরক্ষায় নিত্য নতুন উপায় উদ্ভাবন বা শরণের আবিষ্কার করেন। এ প্রক্রিয়ায় জীবজন্তু তো বটেই, মানবও গাছ-পালায়, নদী-নালায়, বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে-পর্বতে, গুহা-গহ্বরে যেখানেই সুরক্ষার আশ্বাসন পেয়েছে সেখানেই শরণ নিয়েছে। নতুন শরণে আসতে হলেই পুরাতন শরণ ছাড়তে হয়। এভাবে মানবকে অনেকবার শরণস্থল বদলাতে হয়েছে। উন্নত শরণ-স্থল পেতে হলে হীন শরণ ত্যাগ করতে হয়।

নদী-নালায়, সমুদ্রের অতল তলে ডুব দিয়ে জীব আত্মরক্ষার প্রয়াস করেছে বহুবার। সাময়িক রক্ষা পেলেও পরিপূর্ণ রক্ষা পায় নি সে আজ অবধি। জলে না পেয়ে গাছপালায়, পর্বত-কন্দরায়, এমনকি পাহাড়ের উত্তুঙ্গ শিখরেও সে চড়েছে আত্মরক্ষার তাগিদে। সেখানেও পায় নি পরিপূর্ণ আত্মরক্ষার আশ্বাসন। জলে-স্থলে কোথাও উত্তম শরণ না পেয়ে এর তল্লাশিতে আকাশে উড়ে বেড়িয়েছে সে

অনেক বার। আকাশেও ঠাঁই নেই চিরকাল আত্মরক্ষার। নীচে পড়ে যাবার ভয় তাকে আরও শংকিত করে তোলে। তাই থলে থেকেই আত্মরক্ষার অন্য উপায়ের কথা সে ভাবে। আকাশের সূর্য-চন্দ্রের সাথে প্রকৃতির অভিন্ন সম্বন্ধ পর্যবেক্ষণ করে সে ভাবতে থাকে জীব-জগতের সাথেও চন্দ্র-সূর্যের নিশ্চয়ই কোন অদৃশ্য সম্বন্ধ থাকবে। হয়ত ঐ সূর্য-চন্দ্রই জীবের সুখ-দুঃখের মূল কারণ, সূর্য-চন্দ্রকে তুষ্টিদান করার মাধ্যমে হয়ত জীব নিজেকে সমস্যা-মুক্ত করতে পারবে ভেবে জীব (এখানে মানব) সূর্য-চন্দ্রের ভুড়ি-ভুড়ি প্রশংসা করতে আরম্ভ করে। সূর্য-চন্দ্রের পূজা-অর্চনার বিবিধ বিধি-বিধান তৈরী হয়। এসবের মাধ্যমে জীব বিবিধ সমস্যার সমাধান পরিপূর্ণভাবে করতে পারে নি। বিচক্ষণ মানুষ চিন্তা করে সূর্য-চন্দ্র তো বস্তুত এক প্রকারের নির্জীব তত্ত্বে তৈরী। জড় পদার্থ কি করে জীবের সমস্যার সমাধান করতে পারবে? সে এরপর উপরোক্ত সব শরণ বর্জন করে আবার নতুন শরণের সন্ধান করতে থাকে। তপ-তপস্যায় দিব্য-দৃষ্টির সৃষ্টি করে সে। দিব্যদৃষ্টি প্রয়োগের মাধ্যমে জীব (মানব) তার চারপাশে আকাশে-বাতাসে অদৃশ্য দেবদেবীর অবস্থান ও তাদের দৈবী বা দানবীয় শক্তির সন্ধান পায়। তা জানতে পেরে মানুষ এর পর দেবদেবীর শরণ নিতে থাকে। দেবেন্দ্র ও অসুরেন্দ্রগণের শরণ নিয়ে জীব আশ্বস্ত বোধ করতে থাকে, তবে তাও সাময়িক কালের জন্যে। তপস্বীদের দিব্যদৃষ্টিতে চন্দ্রের রাহুগ্রস্ত হবার, ভয়নাক দেবাসুর-সংগ্রামের ঘটনাও জানা হয়। যে বা যারা নিজেরাই সমস্যাগ্রস্ত সে বা তারা কি অপর সমস্যাগ্রস্ত প্রাণীর সমস্যার সমাধান পরিপূর্ণভাবে করতে পারবে? সূর্য ও চন্দ্র যদি এতই শক্তিশালী হয়ে থাকেন তবে তাঁরা রাহুগ্রস্ত হলেন কেন? রাহুমুক্ত হতে তাঁদের দুজনকেই বুদ্ধকে স্মরণ করতে হল কেন? তাহলে কি সূর্য ও চন্দ্রের চেয়ে তথাগত বুদ্ধ অধিক শক্তিশালী? তা তো ঘটনা হতে সিদ্ধ হয়। বুদ্ধ নিজেই একথা স্পষ্ট করে একবার বলেছিলেন----

বহুং বে সরণং যন্তি, পব্বতানি বনানি চ,
আরামরুক্খ-চেত্যানি মনুস্সা ভয়তজ্জিতা।

ধম্মপদ গাথা - ১৮৮

নেতং খো সরণং খেমং নেতং সরণমুত্তমং
নেতং সরণমাগম্ম সব্বা দুক্খা পমুচ্চতি ।
ধম্মপদ গাথা - ১৮৯

রাহু, সূর্য, চন্দ্র, আর যে বা যারা নিজেরাই সংসার-বন্ধন হতে মুক্ত নন, যাঁরা নিজেরাই অবিদ্যাচ্ছন্ন রয়েছেন, তাঁরা কি করে অপর অবিদ্যাচ্ছন্নকে মুক্ত করাতে পারবে? মুক্ত ব্যক্তিই বন্দীকে মুক্ত করতে পারে। মার-মুক্ত হয়ে বোধিসত্ত্ব তপস্বী সিদ্ধার্থ সম্যক্ সম্বুদ্ধ হয়েছিলেন। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পর হতে তাঁর পঁয়তাল্লিশ বছরের বুদ্ধচর্যাকালে অগণিত মুক্তিপ্রার্থীকে মারমুক্ত হবার পথ বাতলে দিয়েছিলেন। তার পূর্ণ বিবরণ ত্রিপিটকেও নেই। রয়েছে ওতে মাত্র কিছু মুক্তিকামীর মুক্তি প্রাপ্তির আত্ম-কথা। তাঁদের আত্ম-কথায় নিম্নোক্ত বুদ্ধবাণীর সত্যতা স্বতঃ সিদ্ধ হয়---

যো চ বুদ্ধঞ্চ ধম্মঞ্চ সঙ্ঘঞ্চ সরণং গতো,
চত্তারি অরিয়সচ্চানি সম্মপ্পঞ্ঞায় পস্সতি ।
ধম্মপদ গাথা - ১৯০

দুক্খং দুক্খ-সমুপ্পাদং দুক্খস্স চ অতিক্কমং,
অরিয়ঞ্চট্ঠঙ্গিকং মগ্গং দুক্খূপসমগামিনং ।
ধম্মপদ গাথা - ১৯১

এতং খো সরণং খেমং এতং সরণমুত্তমং,
এতং সরণমাগম্ম সব্বদুক্খা পমুচ্চতি ।
ধম্মপদ গাথা - ১৯২

এ কারণে পালিসাহিত্যে সংগৃহীত বুদ্ধোপদেশের কোথাও চন্দ্র ও সূর্যকে জীবের পূজার যোগ্য বস্তুরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয় নি। তবে চন্দূপম-জাতকের ঋষিরূপী বোধিসত্ত্ব তাঁর মৃত্যুর পূর্বে প্রমুখ শিষ্যের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত 'চন্দ্রাভা' ও 'সূর্যাভা' শব্দ দুটির পারম্পরিক ব্যাখ্যাটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখনীয়। বৌদ্ধ পরম্পরায় বোধিসত্ত্ব-বাণীকে বুদ্ধবাণীর মর্যাদা দেওয়া হয়, কারণ বোধিসত্ত্বগণ কোন পরিস্থিতিতেই অসত্য ভাষণ করেন না। বৌদ্ধ সাহিত্য ও ধর্মে চন্দ্র ও সূর্যকে কর্মস্থান (সমাধির বিষয়)-রূপে প্রয়োগ করে মনকে শান্ত ও একাগ্র করার মাধ্যমে

ওদুটির সদুপয়োগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এতে বিরোধাভাসের কিছুই নেই।

নিষ্কর্ষ: জীব নির্জীবের পূর্ণতা প্রদানে কোন প্রকারে সহায়কের ভূমিকা পালন করতে পারে না। অথচ চন্দ্র-সূর্যের ন্যায় তত্ত্ব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে জীবের পূর্ণতা দানে সহায়ক ও পূরক অঙ্গের ভূমিকা পালন করে।

বিশ্বের মানব-সভ্যতার বিকাশের ইতিহাসে মহামানব তথাগত বুদ্ধের ধর্মই সর্বাধিক প্রচারিত ও বহুজন কল্যাণকারীরূপে প্রশংসিত। বিগত ২৫৯৮ বছর ধরে তাঁর ধর্ম মানব-সমাজের যে কল্যাণ সাধন করে আসছে, তা সূর্য, চন্দ্রাদি কোন গ্রহ-উপগ্রহ বা নক্ষত্রের মাধ্যমে হয় নি বা হবে না। এ দৃষ্টিতে মহামানব বুদ্ধ সূর্য-চন্দ্রাদি কোন গ্রহ-নক্ষত্রের চেয়ে কোন অংশে কম নয়।

প্রায় বারশত বছরের দীর্ঘ ব্যবধানের পর স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্মের পুনরভ্যুদয় হয়। ১৯৫৬ সালে প্রতিবেশী বৌদ্ধ দেশসমূহের অনুকরণে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে ভারত সরকার সাড়ম্বরে রাজকীয় মর্যাদায় ২৫০০ তম বুদ্ধজয়ন্তী উদযাপিত হয়। এর পর হতেই 'বৈশাখী পূর্ণিমা' তিথি ভারতে ও বিশ্বে 'বুদ্ধ-পূর্ণিমা'রূপে অভিহিত হতে থাকে।

বিশ্ব ইতিহাসে বুদ্ধ ব্যতীত অপর কোন মানুষের নামে কোন পূর্ণিমা নামাংকিত হয়েছে বলে কোন প্রমাণ নেই। 'বুদ্ধ পূর্ণিমা' মানবগুণের চরমতা প্রাপ্তির প্রতীক। এ শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমায় বুদ্ধ-মার্গে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সবার সদ্বাসনা অচিরে পূর্ণ হউক, শুভেচ্ছা ব্যক্ত করি।

ভবতু সব্বমঙ্গলং

সংযোজন

১.১ চন্দ-পরিত্তং S. I. 50

রাহুনা গহীতো চন্দো মুত্তো যস্সানুভাবতো,
সব্ব বেরি ভয়ং পরিত্তং তং ভণাম হে।

১। এবম্মে সুতং একং সময়ং ভগবা; সাবত্থিয়ং বিহরতি জেতবনে অনাথপিণ্ডিকস্স আরামে। তেন খো পন সময়েন চন্দিমা দেবপুত্তো রাহুনা অসুরিন্দেন গহিতো হোতি; অথ খো চন্দিমা-দেবপুত্তো ভগবন্তং অনুস্সরমানো; তায়ং বেলায়ং ইমং গাথং অভাসি।

নমো তে বুদ্ধ-বীরত্থু বিপ্পমুত্তোসি সব্বধী,
সম্বাধপটিপন্নোস্মি তস্স মে সরণং ভবা'তি।

২। অথ খো ভগবা চন্দিমং দেবপুত্তং আরব্ভ রাহুং অসুরিন্দং গাথায় অজ্ঝভাসি।

তথাগতং অরহন্তং চন্দিমা সরণং গতো,
রাহু চন্দং পমুঞ্চস্সু বুদ্ধা লোকানুকম্পকা'তি।

৩। অথ খো রাহু অসুরিন্দো চন্দিমং দেবপুত্তং মুঞ্চিত্বা তরমানরূপো; যেন বেপচিত্তি অসুরিন্দো তেনুপসঙ্কমি; উপসঙ্কমিত্বা সংবিগ্গো লোমহট্ঠজাতো একমন্তং অট্ঠাসি; একমন্তং ঠিতং খো রাহুং অসুরিন্দং বেপচিত্তি অসুরিন্দো গাথায় অজ্ঝভাসি।

কিন্নু সন্তরমানো'ব রাহু চন্দং পমুঞ্চসি,
সংবিগ্নরূপো আগম্ম কিন্নু ভীতো'ব তিট্ঠসীতি?

৪। সত্তধা মে ফলে মুদ্ধা জীবন্তো ন সুখং লভে,
বুদ্ধগাথাভিগীতোম্হি নো চে মুঞ্চেয়্য চন্দিমন্তি।

চন্দ্র-পরিত্রাণ

রাহু দ্বারা গৃহীত চন্দ্র যার (যে পরিত্রাণ সুত্তের) প্রভাবে মুক্ত হয়েছিল, সর্ব শত্রু-ভয়-নাশক ঐ পরিত্রাণ হে শ্রোতাগণ, আমরা (এখন) আবৃত্তি করতে যাচ্ছি। [আপনারা তা মনোযোগ সহকারে শুনুন]।

১। এমন আমা কতৃক শ্রুত হয়েছে— এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিকের তৈরী আরামে বিহার করছিলেন। ঐ সময় দেবপুত্র চন্দ্র (চন্দ্রিমা) অসুরেন্দ্র রাহু কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল। এরপর দেবপুত্র চন্দ্র ভগবান বুদ্ধের অনুস্মরণ করে গাথায় রাহু মুক্ত করার অনুরোধ করেন [গাথার গদ্যানুবাদ এরূপ]।

সব প্রকারের মার হতে বিপ্রমুক্ত, হে বুদ্ধবীর, আপনাকে আমার (সাদর) প্রণাম। (আজ আমি) বিপদগ্রস্ত হয়েছি। তাই আপনি (এ শরণপ্রার্থীর) শরণস্থল হোন।

২। এরপর [ভগবান বুদ্ধ তাঁর দিব্য-দৃষ্টিতে চন্দ্রকে রাহুগ্রস্ত দেখে] দেবপুত্র চন্দ্রের ব্যাপারে অসুরেন্দ্র রাহুকে গাথায় [নিম্নলিখিত অনুরোধ করেন] বলেন—

দেবপুত্র চন্দ্র তথাগত বুদ্ধের শরণাপন্ন হয়েছে। লোকানুকম্পক বুদ্ধের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করত, হে রাহু, দেবপুত্র চন্দ্রকে মুক্ত করুন।

৩। এরপর অসুরেন্দ্র রাহু দেবপুত্র চন্দ্রকে গ্রাসমুক্ত করে পলকে (ত্বরিতে) অসুরেন্দ্র বেপচিত্তির কাছে উপস্থিত হন। উপস্থিত হয়ে, সংবেগ প্রাপ্ত হওয়া সত্বেও লোমহর্ষণকারী ভয়ে ভীত হবার ন্যায় অসুরেন্দ্র রাহু একপাশে দাঁড়ান। এভাবে একপাশে দাঁড়ানো (ভীতত্র্যস্ত) অসুরেন্দ্র রাহুকে অসুরেন্দ্র বেপচিত্তি গাথায় এমন বলেন—

হে রাহু, কার ভয়ে ভীত হয়ে এত তাড়াতাড়ি দেবপুত্র চন্দ্রকে কেন গ্রাস-মুক্ত করলে? সংবিগ্ন ও ভীরুর ন্যায় এখানে কেন দাঁড়িয়ে আছো?

৪। আমি বুদ্ধ দ্বারা কথিত গাথায় এভাবে অভিগীত (আদিষ্ট) হয়েছি (যে)- আমি যদি (বুদ্ধের শরণাপন্ন) দেবপুত্র চন্দ্রকে (তাঁর বিমান সহ) গ্রাস মুক্ত না করি তবে আমার মাথা সাত টুকরো হয়ে যাবে। বেঁচে থাকলেও বেঁচে থাকার সুখ এ জীবনে পাবো না।

১.২ সুরিয়-পরিত্তং S. I. 51

সুরিয়ো রাহু গহীতো মুত্তো যস্সানুভাবতো,
সব্ব বেরি ভয়ং নাসং পরিত্তং তং ভণাম হে।

১। এবম্মে সুতং; একং সময়ং ভগবা সাবত্থিয়ং বিহরতি জেতবনে অনাথপিণ্ডিকস্স আরামে। তেন খো পন সময়েন সুরিয়ো দেবপুত্তো রাহুনা অসুরিন্দেন গহিতো হোতি; অথ খো সুরিয়ো দেবপুত্তো ভগবন্তং অনুস্সরমানো; তায়ং বেলায়ং ইমং গাথং অভাসি।

নমো তে বুদ্ধবীরত্থু বিপ্পমুত্তোসি সব্বধী,
সম্বাধ পটিপন্নোস্মি তস্স মে সরণং ভবা'তি।

২। অথো খো ভগবা সুরিয়ং দেবপুত্তং আরব্ভ রাহুং অসুরিন্দং গাথাহি অজ্ঝভাসি।

তথাগতং অরহন্তং সুরিয়ো সরণং গতো,
রাহু সুরিয়ং পমুঞ্চস্সু বুদ্ধা লোকানুকম্পকা'তি।

যো অন্ধকারে তমসী পভঙ্করো,
বেরোচনো মণ্ডলী উগ্গতেজো,
মা রাহু গিলিচরং অন্তলিক্খে,
পজং মম রাহু পমুঞ্চ সুরিয়ন্তি।

৩। অথ খো রাহু অসুরিন্দো; সুরিয়ং দেবপুত্তং মুঞ্চিত্বা তরমানরূপো; যেন বেপচিত্তি অসুরিন্দো তেনুপসঙ্কমি উপসঙ্কমিত্বা; সংবিগ্গো লোমহট্ঠজাতো একমন্তং অট্ঠাসি; একমন্তং ঠিতং খো রাহুং অসুরিন্দং বেপচিত্তি অসুরিন্দো গাথায় অজ্ঝভাসি।

কিন্নু সন্তরমানো'ব রাহু সুরিয়ং পমুঞ্চসি,
সংবিগ্নরূপো আগম্ম কিন্নু ভীতো'ব তিট্ঠসী'তি?

৪। সত্তধা মে ফলে মুদ্ধা জীবন্তো ন সুখং লভে;
বুদ্ধগাথাভিগীতোম্হি নো চে মুঞ্চেয্য সুরিয়ন্তি।
সুরিয়সুত্ত সত্ত সুরিযুগ্গহনসুত্ত A. iv. 100f

সূর্য-পরিত্রাণ

অসুরেন্দ্র রাহু গৃহীত হয়ে দেবপুত্র সূর্য যার (যে বুদ্ধ-ভাষিত পরিত্রাণের) প্রভাবে গ্রাস-মুক্ত হয়েছিলেন, হে শ্রোতাগণ, আমরা সেই পরিত্রাণ পাঠ করতে যাচ্ছি [আপনারা তা মনোযোগ দিয়ে শুনুন]।

১। আমা কর্তৃক এমন শ্রুত হয়েছে— এক সময় ভগবান বুদ্ধ শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথ-পিণ্ডকের (তৈরী) আরামে বিহার করছিলেন। ঐ সময় দেবপুত্র সূর্য অসুরেন্দ্র রাহু কর্তৃক গৃহীত হয়েছিলেন। তখন দেবপুত্র সূর্য (মনে মনে) ভগবানকে অনুস্মরণ করে এ গাথা উচ্চারণ করেন—

সমস্ত প্রকারের ভয়-মুক্ত, হে বুদ্ধ বীর, আপনাকে (আমার) নমস্কার। (আজ) বিপদে পড়ে (আপনার শরণাপন্ন) হয়েছি, কাজেই (আপনি) আমার শরণস্থল হোন।

২। এরপর ভগবান বুদ্ধ [দিব্যদৃষ্টিতে তা জেনে শরণাপন্ন] দেবপুত্র সূর্যের ব্যাপারে অসুরেন্দ্র রাহুকে গাথার মাধ্যমে (এমন) বলেন—

দেবপুত্র সূর্য অর্হৎ তথাগতের শরণাপন্ন হয়েছে। হে অসুরেন্দ্র, রাহু লোকানুকম্পাকারী বুদ্ধের সম্মান রক্ষার্থে (তাঁর শরণাপন্ন) দেবপুত্র সূর্যকে গ্রাস-মুক্ত কর।

যে মণ্ডলাকার ও উগ্রতেজ সম্পন্ন এবং বিরোচন-দায়ক দেবপুত্র আকাশে বিচরণ করেন আমার শরণাপন্ন ঐ সূর্যকে, হে অসুরেন্দ্র রাহু, গ্রাস করো না। তাকে মুক্ত কর।

৩। এর (এ নির্দেশ প্রাপ্তির) পর অসুরেন্দ্র রাহু পলকে দেবপুত্র সূর্যকে মুক্ত করে অসুরেন্দ্র বেপচিতির কাছে যান। [সেখানে অসুরেন্দ্র বেপচিতির কাছে] উপস্থিত হয়ে সংবিগ্ন ও লোমহর্ষণকারী ভয়ে ভীত ও ত্র্যস্ত (হবার ন্যায়) হয়ে একপাশে দাঁড়ায়। এভাবে একপাশে দাঁড়ানো (ভীত ত্র্যস্ত) অবস্থায় রাহুকে দেখে অসুরেন্দ্র বেপচিত্তি গাথার মাধ্যমে (একথা) বলেন— হে রাহু, তুমি দেবপুত্র সূর্যকে এত শীঘ্র মুক্ত করলে কেন (কার ভয়ে)? তুমি (আজ) এত ভীত-ত্র্যস্ত হয়ে কেন এভাবে দাঁড়িয়ে আছো?

৪। (হে অসুরেন্দ্র বেপচিতি) আজ আমি ভগবান বুদ্ধের মাধ্যমে গাথায় আদিষ্ট হয়েছি (এই বলে যে)- যদি আমি দেবপুত্র সূর্যকে গ্রাস-মুক্ত না করি তবে আমার মাথা সাত টুকরো হয়ে যাবে। বেঁচে থেকেও বাঁচার সুখ এ জীবনে আর পাব না।

পালি-সাহিত্যে আগত 'চন্দ' শব্দের সমানার্থক শব্দ-সূচী

অঙ্কো	জুন্হা	সসঙ্কো
ইন্দু	জোতি	সসলঞ্ছন
উলু রাজা	তারা	সসবিন্দু
ওসধী	তুহিনং	সসধরো
ওসধিনাথ	দোসিনা	সসী
ওসধিপতি	দ্বিজরাজো	সসলক্খণ
ওসধীসো	নক্খত্ত	সিতকর
কন্তি	নক্খত্ত-রাজা	সীতংসু
কলানিধি	নিসাকান্ত	সীতরংসু
কুমুদবন্ধু	নিসাকরো	সীতলো
কোমুদী	নিসানাথো	সুধংসু
কোমদিপতি	নিসাপতি	সুধাকর
চন্দ	পসাদো	সুসমা
চন্দ-মণ্ডল	বিধূ	হিম
চন্দিমস	মিগঙ্কো	হিমংসু
চন্দিকা	লঞ্ছনো	হিমরংসি
চন্দিমা		হিমকর

সহায়ক গ্রন্থসূচী

১। অঙ্গুত্তরনিকায় (A.)

২। অঙ্গুত্তরনিকায়-অত্থকথা (A. A.)

৩। অভিধানপ্পদীপিকা-টীকা (Abhpd.)

৪। জাতক (J.)

৫। দীঘনিকায় (D.)

৬। দীঘনিকায়-অত্থকথা (DA.)

৭। ধর্মপদ (Dh.)

৮। ধম্মপদ-অট্ঠকথা (DhA.)

৯। পটিসম্ভিদামগ্গ (PS.)

১০। পটিসম্ভিদামগ্গ-অট্ঠকথা (PSA.)

১১। বিনয়পিটক (Vin.)

১২। বিভঙ্গ (Vibh.)

১৩। বিভঙ্গ-অট্ঠকথা (সম্মোহবিনোদনী) (VibhA.)

১৪। বিমানবত্থু (Vv.)

১৫। বিমানবত্থু-অট্ঠকথা (VvA.)

১৬। মিলিন্দপঞ্হ (Mil.)

১৭। সংযুত্তনিকায় (S.)

১৮। সংযুত্তনিকায়-অত্থকথা (SA.)

ত্রি-পিটক (বাংলা)

					১	২	৩
	পালি শব্দে		বাংলা অর্থ		বিনয়-পিটক	সূত্র-পিটক	অভিধর্ম-পিটক
১।	পারাজিকা পালি	বিভঙ্গ	প্রধান অপরাধ সংগ্রহ	বিশেষ-বিভাজন			
২।	পাচিত্তিয় পালি		প্রায়শ্চিত্ত মূলক ছোট অপরাধ সংগ্রহ				
৩।	মহাবগ্গ পালি	খন্ধক	বড় ভাগ	স্কন্ধ			
৪।	চুলবগ্গ পালি		ছোট ভাগ				
৫।	পরিবার পালি		বিনয়ের সার সংক্ষেপ				
৬।	দীঘ-নিকায়		দীর্ঘ সূত্র সংগ্রহ				
৭।	মজ্ঝিম-নিকায়		মধ্যম সূত্র সংগ্রহ				
৮।	সংযুত্ত-নিকায়		মিশ্রিত সূত্র সংগ্রহ				
৯।	অঙ্গুত্তর-নিকায়		সংখ্যানুসারে সজ্জিত সূত্র সংগ্রহ				
১০।	খুদ্দক-নিকায়		ক্ষুদ্রক আকারের সূত্র সংগ্রহ				
	(ক) খুদ্দক-পাঠ		(ক) ক্ষুদ্র পাঠ			*	
	(খ) ধম্মপদ		(খ) সত্য পথ			*	
	(গ) উদান		(গ) প্রীতিপূর্ণ সংক্ষিপ্ত উদ্গার			*	
	(ঘ) ইতিবুত্তক		(ঘ) এইরূপে উক্ত-সূত্র			*	
	(ঙ) সুত্তনিপাত		(ঙ) বিশেষ সূত্র-সংগ্রহ			*	
	(চ) বিমানবত্থু		(চ) বিমান-কাহিনী			*	
	(ছ) পেতবত্থু		(ছ) প্রেত-কাহিনী			*	
	(জ) থেরগাথা		(জ) স্থবিরদের আত্মকথা			*	
	(ঝ) থেরীগাথা		(ঝ) স্থবিরাদের আত্মকথা			*	
	(ঞ) জাতক		(ঞ) বুদ্ধের অতীত জন্ম কথা			*	
	(ট) নিদ্দেস		(ট) নির্দেশমূলক বুদ্ধবাণীর সংগ্রহ			*	
	(ঠ) পটিসম্ভিদামগ্গ		(ঠ) বিশ্লেষণাত্মক জ্ঞান			*	
	(ড) অপদান		(ড) অর্হৎগণের জীবনী			*	
	(ঢ) বুদ্ধবংস		(ঢ) বুদ্ধগণের জীবনী			*	
	(ণ) চরিয়া-পিটক		(ণ) বোধিসত্ত্বগণের চর্যা সংগ্রহ			*	
	(ত) মিলিন্দ পঞ্ঞহা		(ত) মিলিন্দ প্রশ্ন			*	
	(থ) নেত্তিপ্পকরন		(থ) পথনির্দেশক			*	
	(দ) পেটকোপদেস		(দ) পিটক সমূহের মূল উপদেশ			*	
১১।	ধম্মসঙ্গনী		ধর্ম সমূহের গণনা শ্রেণী বিভাজনমূলক পুস্তক				
১২।	বিভঙ্গ		বিশ্লেষণমূলক পুস্তক				
১৩।	কথাবত্থু		দার্শনিক মত-বিরোধ মীমাংসামূলক পুস্তক				
১৪।	পুগ্গলপঞ্ঞত্তি		ব্যক্তির শ্রেণী বিভাজনমূলক পুস্তক				
১৫।	ধাতুকথা		মূল তত্ত্বের আলোচনামূলক পুস্তক				
১৬।	যমক		যুগ্ম-বিষয়ক পুস্তক				
১৭।	পট্ঠান		প্রত্যয়-সম্পর্কে পুস্তক				

বি. দ্র.: ষষ্ঠ সঙ্গীতিতে ক্ষুদ্রক-নিকায়ে আরও ৩টি গ্রন্থ (ত, থ ও দ) সংযোজিত করা হয়।

গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

নাম	ঃ	ড. ভিক্ষু সত্যপাল
পিতার নাম	ঃ	ঁবিনোদ বিহারী বড়ুয়া
মাতার নাম	ঃ	শ্রীমতী যুথিকা রাণী বড়ুয়া
জন্ম স্থান	ঃ	হলদিবাড়ী চা বাগান জলপাইগুড়ি (প. ব.)
জন্ম তারিখ	ঃ	০১. ০৩. ১৯৪৯

শিক্ষাগত যোগ্যতা	ঃ	ত্রিপিটক বিশারদ (স্বর্ণ-পদক প্রাপ্ত) এম. ফিল., পি. এইচ. ডি. (দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়)
পেশা	ঃ	অধ্যাপনা, বৌদ্ধ অধ্যয়ন বিভাগ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৮১ হতে -) বর্তমানেঃ বিভাগীয় প্রধান
প্রকাশিত গ্রন্থ	ঃ	(১) তেলকটাহগাথা (বঙ্গানুবাদ সহ) (২) খুদ্দক-পাঠ (ইংরেজী ও হিন্দী অনুবাদ সহ) (৩) কচ্চায়ণ-ন্যাস (১ম ভাগ) (৪) ধম্ম-সংগহ (১ম ভাগ) (৫) বাবাসাহেব ড. আম্বেদকর, (৬) বৌদ্ধ ভারত ও পশ্চিমবঙ্গে বাঙ্গালী বৌদ্ধ সমাজ (৭) শরণ-গ্রহণের পরম্পরা
গ্রন্থ-সম্পাদনা	ঃ	(১) 'মৈত্রী' স্মরণিকা (১৯৮২) (বুদ্ধ ত্রিরত্ন মিশন, দিল্লী) (২) 'ভিক্ষু-পরিবাস' স্মরণিকা (১৯৮৯) (ভারতীয় সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা)। (৩) 'ধম্মচক্কং' স্মরণিকা (১৯৯৩ - ২০০৯) (বুদ্ধ ত্রিরত্ন মিশন, দিল্লী) (৪) 'The Buddhist Studies' –Journal of Department of Buddhist Studies University of Delhi, Delhi - 110007
প্রকাশনার অপেক্ষায় (গ্রন্থ ও নিবন্ধ)	ঃ	**২০ টির পাণ্ডুলিপি তৈরী (বাংলা, ইংরেজী ও পালি ভাষায়)**

DEDICATION OF MERIT

May the merit and virtue
accrued from this work
adorn Amitabha Buddha's Pure Land,
repay the four great kindnesses above,
and relieve the suffering of
those on the three paths below.
May those who see or hear of these efforts
generate Bodhi-mind,
spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
and finally be reborn together in
the Land of Ultimate Bliss.
Homage to Amita Buddha!

NAMO AMITABHA

南無阿彌陀佛

《孟加拉文： PALI SAHITYE: CHANDRA KATHA,
巴利經典中佛陀本生故事》

財團法人佛陀教育基金會 印贈
台北市杭州南路一段五十五號十一樓
Printed and donated for free distribution by
The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation
11F., 55 Hang Chow South Road Sec 1, Taipei, Taiwan, R.O.C.
Tel: 886-2-23951198 , Fax: 886-2-23913415
Email: overseas@budaedu.org
Website: http://www.budaedu.org

This book is strictly for free distribution, it is not for sale.
এই বই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, বিক্রয়ের জন্য নহে।

Printed in Taiwan
7,000 copies; April 2013
BA045 - 11145